শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

—প্রকাশক—

বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স্ লিমিটেড্

শিকারী—**আশুতোষ লাইব্রেরী**

৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ;

৩।৮নং জনসন রোড, ঢাকা

প্রথম সংস্করণ

১৩৫৬

—মুদ্রাকর—

শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্র সুর

**আশুতোষ প্রেস**

ঢাকা

*

*　　*

আমার সত্যিকারের কাকামণি ঃ

**শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন গুপ্ত,** এম-এ., বি-এল.

মহাশয়ের

করকমলে

আমার

**রাখী-বন্ধনের**

কল্পনার কাকামণির

বিচারের ভার তুলে দিলাম।

*　　*

*

ইত্না গুপ্তবাড়ী
যশোহর

স্নেহার্থী
**নীহার**

অমিতা খাবারের ডিস্ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করিল।

# রাখী-বন্ধন

## এক

শীতের অস্বচ্ছ কুয়াসার আবরণ ভেদ ক'রে সবে ভোরের প্রথম আলো পূর্ব্বাচলের মেঘ-তোরণকে রাঙিয়ে তুলেছে।

একটি রাঙা সূতার রাখী অমিতা সুজিতের ডান হাতে মণিবন্ধে বাঁধতে বাঁধতে গভীর স্নেহসিক্ত স্বরে বললেঃ এস ভাই সুজিৎ, আজ হতে দেশের সাথে, আমি তোমায় এই রাঙা-রাখীর বাঁধনে বেঁধে দিলাম। আজ হতে দেশ তোমার এবং তুমি দেশের!

উভয়ে চোখ বুজে ভক্তিগদগদ চিত্তে মায়ের চরণতলে নতি জানাল।

ভৃত্য রঘু এসে বললে : দিদি, অর্জ্জুনবাবু এসেছেন।

: তাকে উপরে নিয়ে এস, রঘু!

সুজিৎ শুধাল : কে এই অর্জ্জুনবাবু, অমি'দি ?

: অর্জ্জুনলাল।···রিপণে পড়ে, জাতিতে মারহাটি। কাকামণির অতি প্রিয় ছাত্র। কাকামণি ওকে নিজের ছেলের মতই ভাল-বাসেন।

অল্পক্ষণ বাদেই পায়ের শব্দে মুখ তুলে চাইতেই দেখা গেল অর্জ্জুনলাল ঘরে প্রবেশ করছে।

অর্জ্জুনলাল মৃদু হেসে হাত তুলে বললে : নমস্কার।

: নমস্কার। এস!—কিন্তু একি! তোমাকে বড় ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে, অর্জ্জুন ?

সুজিৎ মুখ তুলে চাইলে।

এত সুন্দর কেউ থাকে নাকি ? সুজিৎ সত্যি কোন দিনও এ ভাবতে পারেনি। বলিষ্ঠ পেশীবহুল হস্ত, বক্ষ খদ্দরের পাঞ্জাবীর আড়াল হতে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ সাড়ে ছয় ফিটের উপরেও লম্বা। মাথা ভর্ত্তি লম্বা লম্বা চুল বিপর্য্যস্ত। দুটি চক্ষুই ঘুমক্লান্ত। সত্যি, দেখলেই মনে হয় অর্জ্জুনলাল যেন আজ বড়ই ক্লান্ত।

: কি ব্যাপার বলত ?

: কাল সারাটা রাত একটা কলেরা রোগী নিয়ে জাগতে হয়েছে, শেষ রাতের দিকে মারা গেল। চিতায় চড়িয়ে দিয়ে অমরেশ ও সত্যবানকে সব ভার দিয়ে এই মাত্র শ্মশান থেকে আসছি। এক কাপ চা খাওয়াতে পার ?···

সুজিৎ উঠছিল। অমিতা তাকে বললে ঃ সন্ধ্যার দিকে একবার এসো সুজিৎ, এক যায়গায় যাবো !...

সুজিৎ ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

ষ্টোভে চায়ের জল চাপিয়ে অমিতা ময়দা মাখতে মাখতে গাইছিল,—'দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই'...

ঃ ওই এসেছে, কিন্তু তোমরাই সাড়া দিতে পারছ না, অমু ?

আমতা পিছন পানে তাকিয়ে দেখে, তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে কখন এক সময় কাকামণি পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ঃ ওমা ! কাকামণি !

ঃ হাঁ মা ! আমি। ভাবছিলাম, আজ কি খুবই তাড়াতাড়ি ঘুম হতে জেগে গোছ !

ঃ না কাকামণি ! আমারই আজ একটু দেরী হয়ে গেছে। সুজিৎ এসেছিল, তারপর এইমাত্র অর্জ্জুনলাল এসেছে, তাই !

ঃ অর্জ্জুনলাল ? কোথায় ?

ঃ ওই পাশের ঘরে আছে।

ঘরে ঢুকে কাকামণি দেখলেন, অর্জ্জুনলাল চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে। এলোমেলো বিপর্য্যস্ত চেহারা। একটু বেশ বিস্মিত হয়েই ওর কপালে একখানি হাত ছোঁয়াতেই অর্জ্জুনলাল চোখ মেলে চাইলে।

ঃ তুমি কি অসুস্থ অর্জ্জুন !

ঃ না, কাল একটু রাত জাগতে হয়েছিল।

ঃ ও !...একটু ঘুমুবে কি ?

ঃ না, বিশেষ প্রয়োজন নেই।···এখুনি একবার বেলেঘাটায় যাবো, আশীষের কাছে, পরশু ওর রেণুর কাছে টাকার জন্য যাবার কথা ছিল, কি হলো তাই জানতে।

অমিতা খাবারের ডিস্ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

ঃ ওকে এক কাপ গরম দুধ এনে দাও, অমু!—কাকামণি বললেন।

ঃ হাঁ, রঘু নিয়ে আস্ছে।

পরক্ষণেই রঘু এক হাতে এক কাপ গরম দুধ ও অন্য হাতে এক কাপ চা নিয়ে এসে ঢুকল।

রঘুর হাত হতে দুধের কাপটা নিয়ে এক ঢোকে অর্জ্জুন দুধটা খেয়ে নিয়ে চায়ের কাপ তুলে নিল।

দুধটা পান করবার সময় অর্জ্জুনের মুখের বিকৃত ভাবটি লক্ষ্য করে মৃদু হেসে কাকামণি বললেনঃ আমাদের দেশের ছেলেরা খেতে জানে না, অর্জ্জুন। তাইত তা'রা হয়ে পড়েছে আজ এত দুর্ব্বল—এত নিঃস্ব! যে দেশের পূর্ব্বপুরুষেরা একদিন সামান্য একটা লাঠি হাতে বাঘের মুখের কাছে এগিয়ে গেছে, সেই দেশেরই ছেলে আমরা, আমাদের চোখের সামনে দুর্ব্বৃত্ত অত্যাচারীরা আমাদেরই মা ও বোন্দের অপমান ক'রে যায়, অথচ আমরা হাত দু'টো উঁচিয়ে তাদের তাড়াটুকু পর্য্যন্ত করতে পারি না।

অর্জ্জুনলালের শূন্য পাত্রটির দিকে চেয়ে অমিতা বললেঃ আর গোটাকতক লুচি দিই, অর্জ্জুন।

: কাকামণির এত বড় একটা খেদোক্তির পরও যদি এত অল্প খেয়েই উঠে পড়ি, তবে আমার দিক থেকেও হয়ত চক্ষুলজ্জার অন্ত থাকবে না, অমিতা !...

অমিতা হাসতে হাসতে লুচি আনবার জন্য উঠে চলে গেল।

খাওয়ার পর একটা শুক্‌নো তোয়ালেতে হাত মুখ মুছতে মুছতে অর্জ্জুন বললে : যে দেশের অর্দ্ধেকের বেশী লোক দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের অভাবে অর্দ্ধাহারে, অনাহারে কাটায়, সেই দেশের লোকের পেটপুরে লুচি খাওয়াটা আমার কাছে সত্যিই বড় হাস্যকর মনে হয়। কিন্তু সেই ছোট বেলা থেকে রাজভোগ খেয়ে খেয়ে এমন একটা বিশ্রী অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে যে, লুচি মণ্ডা দেখলেই ক্ষুধা যেন আপনা-আপনি জেগে উঠে।

অর্জ্জুনলালের কথায় অমিতা হেসে উঠল।

: বেশত, এবার হতে ক্ষিদে পেলে দুটি মোটাচালের ভাত আর গোটাদুই আলুসিদ্ধ না হয় করে দেব !

: দেশপ্রীতি খুবই ভাল বস্তু, অর্জ্জুন ! কিন্তু অন্ধ দেশাত্মবোধ উৎকট ব্যাধিরই সমান।

কথাটা বলছিলেন কাকামণি। উভয়েই তাঁর দিকে তাকাল।

---

# দুই

রেণুর বাবা স্যার ব্রজেন্দ্রলাল সিংহ্ পাটের দালালী ক'রে আজ কোটীপতি। টালিগঞ্জে গঙ্গার কিনারায় তাঁর প্রাসাদোপম সুবৃহৎ মর্ম্মর আবাস 'নীলাচল'। এই পৃথিবীতে তাঁর আপনার বলতে একমাত্র মাতৃহারা কন্যা রেণু ব্যতীত আর দ্বিতীয় কেউ নেই। রেণু যখন আড়াই বছরের, তখন তা'র মা নীলাদেবী মারা যান। সেই আড়াই বছর হতে বুকে পিঠে ক'রে আজ ব্রজেন্দ্রলাল রেণুকে আঠাবো বছরের ক'রে তুলেছেন।

রেণু কলেজে আই. এস্-সি পড়ে।

অত্যন্ত কঠোর-প্রকৃতি ব্রজেন্দ্রনাথ রেণুর কাছে দুই বছরের একটি শিশুর চাইতেও কোমল।

বাড়ীতে দাস-দাসীর প্রাচুর্য্য থাকলেও দুই বেলা নিয়মিত মেয়ের খুঁটিনাটি প্রতিটি খবর নিজে না নিলে কিছুতেই যেন তিনি একটুকুও সুস্থির থাকতে পারতেন না। তাঁর হৃদয়ের সমগ্র স্নেহটুকু নিশিদিন যেন ওই মাতৃহারা রেণুরই জন্যে উন্মুখ ও ব্যাকুল হয়ে থাকত।

কিন্তু ব্রজেন্দ্রলালের এত সতর্ক চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও রেণু ছিল চিররুগ্না!...পাত্‌লা ফিন্‌ফিনে চেহারা, এবং এত পলকা যেন মনে হত, ও হয়ত একটা জোর হাওয়ার ঝাপটাও সইতে পারবে না। এই শরীর নিয়ে পড়াশুনা করতে দেওয়ার ইচ্ছা স্যার ব্রজেন্দ্রলালের ছিল না, কিন্তু কন্যার একান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলতেও তিনি কিছুতেই পারতেন না।

কাল হতে শরীরটা একটু অসুস্থ ; বিছানায় শুয়ে বেড-কভারটা গায়ের উপর চাপিয়ে মাথার দিকের টেবিল-ফ্যান্‌টা চালিয়ে দিয়ে রেণু একমনে রবীন্দ্রনাথের গোরা পড়ছিল।

ঃ রেণু—

ঃ কে ?

বই হতে মুখ ওর ফিরাতেই চোখ দু'টা অতিশয় আনন্দে ঝক্ ঝক্ করে উঠ্‌লো !···একটু দূরে দাঁড়িয়ে অর্জ্জুনলাল।

ঃ আপনি ?—রেণু ব্যস্তসমস্তে উঠে বসতে গেল।

ঃ না না, উঠ না !···বড় অসুস্থ দেখাচ্ছে, শরীর কি আবার খারাপ হল ?

রেণু ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে, বললেঃ আপনার জন্যই ত ! আপনার কথামত ব্যায়ামচর্চ্চা করেই ত এই ঝঞ্ঝাট !··· কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন !

ঃ হাঁ, এই বসি। ঘরের একদিক হতে একটা চেয়ার টেনে এনে অর্জ্জুনলাল বসে পড়ল।

ঃ আজ ব্যায়ামটা বাদ দেবে, বুঝলে ! শরীর একটু ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত যেন আবার ধরো না। একটু একটু ক'রে সইয়ে নিতে হবে ! জান ত, আমাদের দেশে একটা কথা আছে— "শরীরের নাম 'মহাশয়', যা সওয়াবে তাই সয় !"···

ঃ জানি।—রেণু হাসলে।—কিন্তু এত সকালে কোথা হতে আসছেন ? মেস্ থেকেই নাকি ?

ঃ না। মেস্ হতে নয় ! অমিতাদের ওখান হতে।

ঃ অমিতা কে ? কাকামণির ভাইঝি ?···

ঃ হ্যাঁ···

ঃ আচ্ছা, কাকামণির সব পরিচয় আমায় একদিন দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু কই, আজও ত বললেন না ?

ঃ কাকামণি !···একটু থেমে নিয়ে অর্জ্জুন বললেঃ ওর আসল নাম অনির্ব্বাণ চৌধুরী।···রিপণের ইংরাজীর অধ্যাপক।···অমিতার মুখে শুনেছি, উনি যেবার ইংরাজীতে বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, তারপরই ওঁর বাবা ওঁকে বিলাত পাঠান আই-সি-এস্ হয়ে আসবার জন্যে ! কিন্তু বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল, কিন্তু উনি ওই যে গেলেন, আর ফিরলেন না। শেষে একবার বিলেতে ওঁর নামে টাকা গিয়ে ফিরে এল, ওঁর পাত্তা মিলল না বলে।

—তারপর দীর্ঘ উনত্রিশ বৎসর পরে অমিতার পিতার মৃত্যুশয্যায় উনি ফিরে এলেন। অমিতার বাবার সংসারেও ঐ একমাত্র কন্যা অমিতা ভিন্ন আর দ্বিতীয় প্রাণীটি ছিল না। ভাইয়ের হাতে একমাত্র কন্যার ভার তুলে দিয়ে তিনিও পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজলেন।

—কাকামণি ইংরাজী ও ইকনমিক্সে লণ্ডন ইউনিভারসিটির মোটা ডিগ্রী সংগ্রহ করে এনেছিলেন, এখানকার একটা বে-সরকারী কলেজে অধ্যাপনার কাজ জোটাতে তাঁকে খুব বেশী বেগ পেতে হয়নি !···শোনা যায়, তিনি আজও অবিবাহিত। এইটুকুই কাকামণির পরিচয়।···কিন্তু আসল মানুষটার পরিচয় যে কী এবং কতখানি, সে শুধু তিনিই জানেন যিনি তাঁকে এই মাটির পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন !···এ জীবনে দু'টো বস্তু আমার সকল অনুভূতিরই বাইরে

রয়ে. গেল,—এক সমুদ্র আর এক এই কাকামণি!···এদের হদিস্ আজও আমি পেলাম না, রেণু ?—শেষের দিকে অসীম শ্রদ্ধা ও' ভক্তিতে, অর্জ্জুনের কণ্ঠস্বর জড়িয়ে গেল।

এর পর উভয়েই কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। পিছনে পায়ের শব্দে উভয়েই চোখ তুলে তাকাল, দেখা গেল, রেণুর দাই মা সুখিয়া। তা'র একহাতে এক পেয়ালা গরম দুধ ও অন্য হাতে এক কাপ চা!···

ঃ দেখ রেণু, সুখিয়া কেমন ক'রে বুঝে নিয়েছে চা বস্তুটার প্রতি আমার কেমন একটা আকর্ষণ আছে।···

ঃ তুমি কেমন আছ, অর্জ্জুনবাবু।···অনেক দিন এদিক পানেই যে আসছ না!

অর্জ্জুন ও রেণু উভয়েই হাসলে, চোখ চাওয়াচাওয়ি ক'রে বললে ঃ 'বহুৎ আচ্ছা সুখিয়া!···তারপর তোমার শরীর ভাল ত'!···

ঃ আর আমার শরীর! ওই বেটীর একটা সাদি হয় তবেই আমার ছুটি!···এ বুড়ো হাড় এবার যাই-যাই করছে।

সুখিয়া রেণুর মার সহচরী ছিল, রাজপুত্‌নী। তারপর ওর মার মৃত্যুর পরেও এ বাড়ী ছেড়ে যায়নি। আজ ওর বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি।

ঃ তারপর কী মনে করে এলেন বলুন ত'?

ঃ আশীষ এসেছিল কি?···

ঃ হাঁ এসেছিল, কিন্তু সেদিন হাতে ছিল না বিশেষ কিছুই, দিন দশেক পরে আসতে বলেছিলাম। এখন আপনার হাতে দেব কি?···

ড্রেসিং টেবিলের একটা ড্রয়ার হতে একটি সুদৃশ্য শ্বেত পাথরের জয়পুরী কৌটা খুলে দশ টাকার খান পাঁচেক নোট, রেণু অর্জ্জুনের হাতে এনে তুলে দিল। অর্জ্জুনের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল : আচ্ছা অর্জ্জুনদা! এত টাকা তোমার কিসের প্রয়োজন? কি হবে এই টাকায়?

হাতের মুঠোয় নোট ক'খানি ধরে অর্জ্জুন ক্ষুব্ধ স্বরে বলল : টাকা? ...বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার জ্বালা রেণু, সে জ্বালা মিটাতেই এর প্রয়োজন!...দিনের পর দিন ব্যথা বেদনা ও ক্ষুধার যাতনা সয়ে সয়ে আজ সব পাথরের মতই জমাট বেঁধে গেছে, রেণু!...চোখের জলে সে পাথরের ত' কিছুই হবে না! লক্ষ কোটি নিঃস্ব মানবের ক্ষুধা যে আজ গরল হয়ে কণ্ঠ ঠেলে বেরিয়ে আসছে!...কিন্তু কাকে বলি বলত! কে বুঝবে বা বুঝতে চায় এসব কথা, কতকগুলি মূর্খ ভয়াতুর জড়পদার্থ বইত নয়?

অর্জ্জুনলালের বুক কাঁপিয়ে একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

রেণু মূক হয়ে রইল।

অর্জ্জুনলালের এতখানি চঞ্চলতা ইতিপূর্ব্বে কোনদিনও দেখেছে বলে মনে হলো না!

অর্জ্জুনলালের কথা শুনতে শুনতে ও যেন কোথায় কত দূরে চলে গেছল! হঠাৎ চমক ভাঙতেই চেয়ে দেখে, ঘর শূন্য, অর্জ্জুনলাল নেই। যেমন নিঃশব্দে সে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে কখন চলে গেছে।

---

## তিন

রেণুর কাছ হতে বিদায় নিয়ে অর্জ্জুনলালের প্রথমেই মনে হলো, কর্ম্মায়তনের সেক্রেটারী প্রফুল্লকে এ টাকাগুলি এখুনি দিয়ে আসতে হবে; সে আজ কয়দিন হতেই টাকার জন্য তাগিদ দিচ্ছে। খিদিরপুরের বস্তিতে টাকার অভাবেই যেতে পারছে না।

বেলা তখন প্রায় দশটা সাড়ে দশটা। রাজপথে লোক আর ধরে না। কর্ম্মচঞ্চল সহরের বুক ছেয়ে পিঁপড়ের সারির মতই লোকের চলাচল।

নীল আকাশ সূর্য্যের আলোয় ঝক্ ঝক্ করছে। এখান থেকে কর্ম্মায়তনে পৌঁছতে অনেকটা বেলা হয়ে যাবে; কলেজের প্রথম দু'টো ঘণ্টায় অবিশ্যি ওর ক্লাশ নেই। অর্জ্জুনলাল এস্প্লানেড অভিমুখী একটা ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাশে উঠে পড়ল।

কর্ম্মায়তনটা বরাহনগরের কাছে গঙ্গার ধারে। প্রায় দুই বিঘে জমির চার পাশ টিনের বেড়া দিয়ে ঘিরে নেওয়া হয়েছে।

ঢুকতেই প্রথমে সেক্রেটারির আফিস।···

তিন হাত সাড়ে তিন হাত চওড়া মাটির পথ। পথের দু'পাশে ছোট ছোট টালি ও টিনের সেড্। কোনটায় লেখা আছে 'সূতাকাটার ঘর,' কোনটায় 'তাঁতঘর,' কোনটায় 'Dyeing' অর্থাৎ রং করার ঘর; কোনটায় 'Pottery' অর্থাৎ মাটির জিনিষ-পত্র তৈরী করা

হয় ; কোনটায় প্রেস—প্রচার-পত্রাদি ছাপা হয় ; কোনটায় বেতের জিনিষ-পত্র তৈরী হয়। এমনি সব এক-একটি ঘর এক-একটি বিশেষ কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। তারপর Library বা পাঠাগার এবং Debating ( বিতর্ক ) ঘর। এরপর একটা খোলা জমি, সেখানে সকলে সকাল ও সন্ধ্যায় শরীরচর্চ্চা করে। ওরই একধারে ছোট্ট একটা ব্যারাকের মত। প্রায় কুড়ি পঁচিশটি ছেলে সেখানে বাস করে, খাওয়া দাওয়ার যোগার-যন্ত্র করে পাচক ঠাকুর ও একজন চাকর। ছেলেদের মধ্যে কেউ কলেজে, আবার কেউ স্কুলে পড়ে। কর্ম্মায়তনের সব কিছুই কাকামণির পরিকল্পনায় তাঁরই হাতে গড়া। তাঁর জীবনের সমস্ত সংগৃহীত অর্থ এর পিছনেই তিনি ব্যয় করেছেন।

অর্জ্জুনলাল যখন কর্ম্মায়তনে এসে পৌঁছাল বেলা তখন প্রায় বারোটা।···

কর্ম্মায়তনের সকলেই স্কুল-কলেজে বেরিয়ে গেছে, শুধু শ্যামল বলে' একটি ছেলে, তা'র নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে কি একখানি বই পড়ছিল। বেচারীর আগের দিন ব্যায়াম করবার সময় হঠাৎ হাত ফস্কে ভারী মুগুরটা পায়ের উপর পড়ায়, পায়ের পাতাটা এত বেশী ফুলে গিয়েছিল যে হাঁটতেও ওর অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল, তাই ও আজ স্কুলে যায়নি।

ভৃত্য গদাধরের কাছে একমাত্র শ্যামলই ঘরে আছে শুনে অর্জ্জুনলাল ওর ঘরে এসে প্রবেশ করল।

ঃ শ্যামল ?···

ঃ কে, অর্জ্জুন দা ?···অন্ধকার রাতে এক ঝলক আলোর মতই অর্জ্জুনলালকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে শ্যামলের সমস্ত মুখখানা আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ঃ হ্যাঁ ভাই, আমি !···

একান্ত সাবধানে শ্যামলের ভাঙ্গা পাখানি পরম যত্নে কোলের উপর টেনে নিয়ে সস্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে অর্জ্জুনলাল বললেঃ ব্যথাটা কি খুব বেশি শ্যামল ?···

ঃ কাল সারা রাত খুব ব্যথা ছিল, কিন্তু অমিয়দা চূণ হলুদ গরম করে দেওয়ায় সকাল হতে ব্যথাটা অনেক কমে গেছে।

ঃ হাড় ফ্র্যাকচার হয়নি ত' ?

ঃ না, অমিয়দা ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন !

ঃ কাকামণি জানেন ত ?

ঃ হাঁ, তিনি সকালে এখানে এসে প্রথমেই অমিয়দার মুখে আমার কথা শুনে আমায় দেখতে এসেছিলেন। এই দেখুন না কত বিস্কুট, লজেন্স, চকোলেট দিয়ে গেছেন, আমি যেন আজও তেমনি ছেলেমানুষটিই আছি ! · আর একবছর বাদেই ত ম্যাট্রিক দেব !···

ঃ খুব বড় হয়ে গেছ, না শ্যামল ? কত বড় বলত ?···গভীর স্নেহে হাসতে হাসতে দু'হাত দিয়ে অর্জ্জুন শ্যামলকে বুকে টেনে নিল।

অর্জ্জুনের পেশীবহুল হাতটা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে করতে শ্যামল বললেঃ আচ্ছা অর্জ্জুনদা, তোমার বাইসেপ্‌সের মত আমার বাইসেপ্‌স্‌টা কবে মোটা হবে বলত ?···

ঃ নিয়মিত ব্যায়াম করতে করতেই হবে ; আমার চাইতে হয়ত অনেক বড় হবে তোমার বাইসেপ্‌স্‌।···কিন্তু এখন আমায় উঠতে হচ্ছে শ্যামল।

একটু থেমে পকেট হতে নোটগুলি বের ক'রে শ্যামলের হাতে দিয়ে বললেঃ এই টাকাগুলি তুমি রাখ, প্রফুল্লদা এলে তাঁকে আমার নাম ক'রে দেবে।

শ্যামল নোটগুলি বালিশের তলায় গুঁজে রাখলে।

ঃ বিকেলে আবার আসবে ত' অর্জ্জুনদা ?—'

ঃ হঁা নিশ্চয়ই।···প্রফুল্লদাকে বলো, আমার না আসা পর্য্যন্ত যেন অপেক্ষা করেন।

---

## চার

সন্ধ্যা হতে আর খুব বেশী বিলম্ব নেই।

অস্তমান সূর্য্যের শেষ রক্তিমাভা ছাতের কার্ণিসের কোল ছুঁয়ে বিদায়-নতি জানাচ্ছে। দিনের শেষে আকাশের গায়ে সূর্য্যের শেষ রশ্মিগুলি কেমন একটা পাণ্ডুরতায় ম্রিয়মাণ।

অমিতা মেসিনে কয়েকটা ছোট ছোট ছিটের জামা সেলাই করছিল। দ্রুত মেসিন চালনের শব্দ ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। অদূরেই মাটির উপর ব'সে সুজিৎ।...

কাকামণি এসে ঘরে প্রবেশ করলেন: কাজ শেষ হলো মা?...

সেলাই হতে মুখ না তুলেই অমিতা জবাব দিল: আর একটু বাকী।...

: আচ্ছা আমি আমার ঘরে আছি,...হয়ে গেলে রঘুকে পাঠিয়ে দিও!...অমিতা ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

দিনের আলো নিভে গেছে। সন্ধ্যার আঁধার ধূসর ওড়না ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশে ও মাটিতে।

অমিতার সেলাই তখনও শেষ হয়নি। সে নিবিষ্ট মনে জামার প্লিট ভাঙ্গছিল। সুজিৎ ঝুঁকে পড়ে তাই দেখছিল।

হঠাৎ প্রফুল্লের কণ্ঠস্বর শোনা গেল: চোখ জোড়া হঠাৎ কি দোষ করলে বলত অমিতা যে ওদের প্রতি এতটা নিষ্করুণ হয়ে

উঠ্‌লে ?···কোন শক্তিরই অপব্যবহার করাটা শুধু অন্যায়ই নয়, পাপ !···অতএব আলোটা জ্বেলে দেওয়া হলো।

অমিতা হেসে বলল ঃ ধন্যবাদ !···সত্যি একটু কষ্টই হচ্ছিল।

ঃ কিন্তু ওদিকে যে বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে অমিতা।

ঃ হাঁ চলুন। আমি প্রস্তুত। অর্জ্জুনলাল এসেছে ?

ঃ না, সে আসতে পারলে না, হঠাৎ রেণু তাকে ফোনে ডেকেছে, সে সেখানেই গেছে। অমিয় এসেছে।

ঃ রেণুর অসুখটা বাড়েনি ত ? শুনেছিলাম তা'র শরীরটা নাকি অসুস্থ !

অন্ধকার রাত্রি।···কালো আকাশের গায়ে হীরার কুচির মতই তারাগুলি ঝিক্‌মিক্ করছে।

দু'পাশের খোলা ময়দানের মাঝখান দিয়ে কালো পীচের রাস্তা। ঘোড়া-গাড়ীর চাকার বিশ্রী একঘেয়ে শব্দ অবিশ্রান্ত কর্ণকে পীড়িত ক'রে তোলে।

অদূরে কেল্লার অস্পষ্ট ছায়া-মূর্ত্তি, যেন অন্ধকারের বুকে কোন সুদূর অতীতের মৌন স্বাক্ষীস্বরূপ নিশ্চল নিঝুম।

গাড়ীর আরোহী পাঁচ জন। কাকামণি, প্রফুল্ল, অমিতা, সুজিৎ ও অমিয়।

মাঝে মাঝে পথের পাশের গ্যাস্ পোষ্ট হতে আলোর ঝাপ্‌টা চলমান গাড়ীর মুক্ত গবাক্ষ-পথে এক একবার এসে পড়ছে। অদূরে চৌরঙ্গীর দীপালোকমালা পথের ধারের গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

হঠাৎ এক সময় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কাকামণি বল্লেন : ডাক্তার, শ্যামলের পা আজ এ বেলা কেমন ?…

অমিয় মেডিকেল কলেজে 'ফোর্থ ইয়ারে' পড়ে, কাকামণি তাকে ডাক্তার বলে' ডাকেন।

প্রথম প্রথম অমিয় এ নিয়ে মৃদু আপত্তি তুলেছিল। কাকামণি বলেছিলেন : আহা! আজ না হও, কালত হবেই গো ডাক্তার!

—তাই বলে'…

—আহা দৃষ্টিটাকে একটু বড় কর ডাক্তার, দৃষ্টিটাকে একটু বড় কর!…আজকের ছোট্ট একটা কুঁড়ি দেখে কালকের ফোটা ফুলটার রূপটাই যদি না কল্পনা করতে পারলে, তবে কী ছাই সবল মনের পরিচয় দাও!…

এই যুক্তির পর অমিয়কে হার মানতে হয়েছিল।

: পা'টা ভালই আছে, মনে হচ্ছে ভয়ের কোন কারণ নেই…

: দেখো, সন্দেহ থাকলে কিন্তু একজন বিচক্ষণ ডাক্তারকে সময় থাকতে ডেকে দেখানই ভাল।

: দেখি কালকের দিনটা!…

গাড়োয়ানের গলা শুনা গেল : খিদিরপুর ডকের কাছে ত বাবু?…

গাড়ীর ভিতর হতে কাকামণি জবাব দিলেন : হাঁ!…

আদি গঙ্গার পারেই এই বস্তি!…সারি সারি প্রায় গোটা পঞ্চাশেক খোলার ঘর।…

ঘোরঘুটে অন্ধকার,—কোথাও আলোর সংস্পর্শ পর্য্যন্ত নেই। সহরের সভ্য ও ভব্যজনার দাবী মিটাতে গিয়ে গ্যাসের পাইপ

এই আবর্জ্জনা পূর্ণ দুর্গন্ধময় বস্তির আঁধারে বুঝি পথ হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের দয়ার সীমা-রেখা পীচ ও পাকা সড়কের দুধারে যতই আলো ও ছায়ায় রহস্যময় হয়ে উঠুক না কেন, এখানে তা'রা অত্যন্ত হিসাবী!

এক হাতে সুজিতের একখানা হাত ও অন্য হাতে অমিতার একখানি হাত চেপে ধরে অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে কাকামণি অন্ধকারের মধ্যে অগ্রসর হলেন।

মানুষের চরম দৈন্যের উলঙ্গ প্রতিচ্ছবি এই বস্তিজীবন। কী শোচনীয় এখানকার জীবন! দিনের পর দিন দৈন্য হাহাকার ও ক্ষুধার সহিত মল্লযুদ্ধ করে' করে' সমাজের বুকে আজ এরা কুশ্রী ক্ষতের মতই দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনা!

একটা পচা ভাপ্‌সা চাপা গন্ধে এখানকার বাতাস ভারী!··· নিঃশ্বাস টানতেও বুঝি কষ্ট বোধ হয়।

চলতে চলতে একটা ঘরের সামনে সকলে এসে দাঁড়াল। দাওয়ার একপাশে একটা কেরোসিনের কুপি দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলে' আলোর চাইতে কালিই বেশী উদ্‌গীরণ করছে। কয়লার চুল্লীতে কাঁচা কয়লা দেওয়া হয়েছে, তাই আশেপাশের সমস্ত স্থানটাই ধূমাচ্ছন্ন। চুল্লীর একধারে একটি স্ত্রীলোক প্রাণপণে মশলা পিষছে। এইত দুলিয়ার ঘর!···

ঃ দুলিয়া! দুলিয়া!

---

# পাঁচ

প্রফুল্লর ডাক শুনে ত্বুলিয়া ঘর হতে বেরিয়ে এল। এই অল্পক্ষণ বোধ হয় ও ডক হতে ফিরেছে।

সর্ব্বাঙ্গে কালিঝুলি মাখা, ওর হাতের কুপির লাল আলো ওর মুখের উপর প্রতিফলিত হওয়ায় ওকে প্রেতের মতই মনে হচ্ছিল।

ঃ ত্বুলালের ছেলের খবর কি ত্বুলি ?

মুখটাকে অদ্ভুত রকমের বিকৃত করে টেনে টেনে ত্বুলিয়া বললে ঃ আজ ফজিরে সাবার হয়ে গেল !···

ঃ এ্যাঁ মারা গেছে ?—প্রফুল্লর স্বগত উক্তিটা যেন কতকটা কান্নার মতই ওর কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এল।

পিছন হতে নীরবে কাকামণি ডান হাতখানি প্রফুল্লর কাঁধের উপর রাখতেই ও চমকে চাইলে পিছন দিকে।

ঃ চল একবার ত্বুলালকে দেখে আসি।

প্রফুল্ল উত্তরে একটি কথাও না বলে নীরবে কাকামণির অনুসরণ করল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলল ঃ এ অন্যায় ! এ অবিচার।··· এই যে আজ বিনা চিকিৎসায়, এক ফোঁটা ঔষধ পর্য্যন্ত না পেয়ে এমনি করে অকালে ত্বুলালের একটি মাত্র ছেলে প্রাণ হারাল, এর কি প্রতিকার নেই ?···

জবাব দিলেন কাকামণি ঃ হাঁ, আজ ওদের এমনি করেই

মরতে হবে। ধনী ও দরিদ্রের মাঝে এই যে পাষাণ প্রাচীর আজ আকাশ পর্য্যন্ত ঠেলে উঠেছে, তুমি কি মনে কর এটা একদিনেই গড়ে উঠেছে? না। ওরা আজ চলার পথে যে মনুষ্যত্ব, যে আত্মবোধ হারিয়ে বুক পেতে সকল কিছু অত্যাচারই তুলে নিচ্ছে, সেটা দু' চার দিনের ভুল নয়। পুরুষ-পুরুষানুক্রমের ভুল। ফোঁটায় ফোঁটায় জল জুগিয়ে যে ব্যথা বেদনাকে ওরা সমুদ্রের মতই অতল ও পারাপারহীন ক'রে তুলেছে তা কি এক-আধ দিনেই ছেঁচে ফেলা যায়?...

ঃ তাই এত কাল যা মুখ বুজে সয়ে এসেছে, আজও কি তা মুখ বুজেই সইবে?

গম্ভীরস্বরে কাকামণি জবাব দিলেন ঃ হাঁ, সইতেই হবে! জোর করে একটা ফুলের কুঁড়িকে ফোটাতে গেলে ফুল ত ফোটেই না, বরং যে ফুল সত্যিই আপনাআপনি একদিন শতদলে গন্ধে ও সৌন্দর্য্যে বিকশিত হয়ে উঠ্‌তে পারত, তার সকল সম্ভাবনা নষ্ট ক'রেই ফেলা হয়। কিন্তু সেই কুঁড়িকে ফোটাতে হলে যেমন সেই গাছের গোড়ায় জল ঢেলে ভাল সার দিয়ে তা'র বাঁচবার সুবিধা ক'রে দিতে হয়, তোমাদেরও তেমনি এই অসহায় মূর্খ অচেতন আত্মাগুলোকে চেতনা দিতে হলে দিনের পর দিন শিক্ষার ভেতর দিয়ে ওদের ভিতরকার ঘুমিয়ে-পড়া চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে।...ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে, ওরা কী, ওরা কে, ওরা কী হতে পারত, আর আজই বা ওরা কী হয়েছে...আর চেষ্টা করলে কালই বা ওরা কী হতে পারে।

সহসা একটা বিশ্রী গোলমাল ওদের কানে এল। একত্রিত

অনেকগুলো স্ত্রীপুরুষের কণ্ঠনিঃসৃত এলোমেলো চীৎকার যেন নৈশ অন্ধকারের বুকে জমাট বেঁধে উঠল।

কাকামণি বললেনঃ ও কিসের গোলমাল! একটু পা চালিয়ে এগিয়ে যাই চল প্রফুল্ল!

ওরা সকলে অন্ধকারে গোলমাল লক্ষ্য করে দ্রুতপদে অগ্রসর হল।

মানুষের বুকে যতগুলি কোমল প্রবৃত্তি আছে—স্নেহ, দয়া, মায়া, ভালবাসা প্রভৃতি আজ তাদের সকল কিছুর সাথেই আরম্ভ হয়েছে এক বিরাট সংঘর্ষ—ক্ষুধা ও তৃষ্ণার, তাই ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষ আজ পশুর মতই খল ও ক্রূর হয়ে নিজেদের মধ্যে আরম্ভ করেছে কামড়া কামড়ি! মানুষের বুকের ভগবান অনশনের জ্বালায় মানুষের দেহ ছেড়ে অজানা স্বর্গের পথে পা বাড়িয়েছেন, আর সেই দেবতাহীন দেহ মাটির ধুলা-কাদায় পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে!

পুত্রশোকে ব্যথিতা জননী আজ নিয়মিত রান্না আগে হতেই রেঁধে রাখতে পারেনি। একটি মাত্র সন্তানকে হারিয়ে আজ যদি সে নিত্যনৈমিত্তিক কাজের রুটিন হতে একটু এদিক-ওদিক ক'রেই থাকে, তবে তাকে অপরাধী করা চলে না। কিন্তু সমস্তটা দিন কারখানায় খেটে, এবং ফিরতি পথে এক ভাঁড় তাড়ি গলায় ঢেলে ঘরে এসে যখন দুলাল দেখলে, রান্নার উনানটি পর্য্যন্ত জ্বলে নাই, স্ত্রী ঘরের মধ্যে শুয়ে, সহসা ক্ষিদেটা যেন তার বত্রিশ নাড়ীর পাকে পাকে দ্বিগুণ প্রবল হয়ে উঠল। সে চীৎকার করে উঠলঃ রান্না হয়নি? কিন্তু স্ত্রীর দিক হতে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। পুত্রশোকের ঝড়, ক্ষুধার তীব্র জ্বালা ও সেই সঙ্গে নেশার

রঙ।...তুলাল তখনকার সেই অবস্থায় আর যাই হোক মানুষ ছিল না; হিতাহিত জ্ঞানশূন্য তুলাল ক্রুদ্ধ নেকড়ের মত স্ত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তারপর এল মজা দেখবার জন্য আশেপাশের তু'দশ জন প্রতিবেশী। কীল, চড়, গালাগালি, চীৎকার...মুহূর্ত্তে স্থানটি হয়ে উঠল সরগরম!

ভিড় ঠেলে অতি কষ্টে কাকামণি, অমিয় ও প্রফুল্ল ওদের মধ্যে এসে গোলমাল কতকটা থামালে। তখন তুলালের বাঁ পাশের কপালের খানিকটা কেটে গিয়ে রক্তে তার সমস্ত মুখটাই লাল হয়ে উঠেছে। ঘরের এক কোণে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে আছে তুলালের স্ত্রী!...

ঃ ডাক্তার, আগে তুমি তুলালের বৌটাকে দেখতো!...প্রফুল্ল, জল দিয়ে রক্তটা ধুয়ে দাও!...

গুরু প্রহারের চোটে তুলালের বৌ মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছিল। চোখে মুখে জলের ঝাঁপটা দিয়ে বাতাস করার পর এক সময় চোখ মেলে চাইল।

ঃ এখন উঠো না বউ! একটু ঘুমাতে চেষ্টা কর তো!... অমিয় বললে। তুলালের বৌ একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস টেনে পাশ ফিরে শু'ল।

সহসা প্রফুল্লের কণ্ঠস্বরে এক সঙ্গে সকলেই ফিরে তাকাল এবং পরক্ষণেই একটা মর্ম্মভেদী আকুল কান্নার ধ্বনি নিস্তব্ধ রজনীর বুকে জেগে উঠল!...

---

প্রফুল্লর-ধাক্কার টাল্‌টা না সামলাতে পেরে······ছিটকে পড়ল···

## ছয়

ঃ কি? কি হয়েছে প্রফুল্ল?—কাকামণি এগিয়ে এলেন। প্রফুল্লর লোহার মত শক্ত হাতের নিষ্পেষণে দুলালের কাঁধের মাংসপেশী তখন ছিঁড়ে আসবার জোগাড়। ওর চোখমুখের দিকে তাকাতেই বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল যে ও অত্যন্ত রেগে গেছে। আর দুলাল হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে কেবলই যেন ওকে কি বোঝাতে চেষ্টা পাচ্ছে!

কাকামণিকে ঘটনাস্থলে এগিয়ে আসতে দেখে প্রবল এক ধাক্কা দিয়ে প্রফুল্ল দুলালকে ঠেলে সরিয়ে দিল। প্রফুল্লর ধাক্কার টাল্‌টা না সামলাতে পেরে দুলাল চৌকাঠের উপর গিয়ে ছিট্‌কে পড়ল।

সহসা ঝুঁকে পড়ে কাকামণির পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে গাঢ় স্বরে প্রফুল্ল বললেঃ আমায় ক্ষমা করুন কাকামণি! এদের ভাল করতে চাওয়া যে কত বড় মূর্খতা ও কত বড় বাতুলতা, তা আজ আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছি! ছিঃ, রাস্তার দুর্গন্ধময় পচা পাঁকের চাইতেও এরা অধম!…চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি যার একমাত্র ছেলে এক ফোঁটা ঔষধের অভাবে চোখের উপর ছট্‌ফট্‌ করতে করতে মারা গেল, সে কিনা দিব্যি অনায়াসে ট্যাকের পয়সা খরচ করে তাড়ি খেয়ে মাতাল হয়? সে কিনা আবার মাতলামি করে? এদের ভাল মন্দ এদেরই মাথায় থাক্‌। এই নাকে কানে খত দিচ্ছি, আর এ পথে নয়! আমি চল্লুম।

প্রফুল্ল অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঃ পাগল !···একেবারে ছেলেমানুষ !—কাকা বললেন।

শক্ত কাঠের চৌকাঠে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে দুলালের তাড়ির নেশা তখন অনেকটা টুটে গেছল! ওর চোখের উপর দিয়ে বুক ভরা অভিমান নিয়ে প্রফুল্ল যখন আচমকা অন্ধকারে এমনি করে অদৃশ্য হয়ে গেল, সহসা দুলালের ভিজা চোখের দু'কোণ বেয়ে ঝর্ ঝর্ করে অশ্রুর বন্যা নেমে এল। এ শুধু অভাবনীয় নয়, আকস্মিক। শত গালিগালাজ, শত প্রহারে যা হতে পারত না বা এতটুকু সম্ভব ছিল না, শুধু একটি মাত্র কোমল প্রবৃত্তির ছোঁয়া পেয়ে তা অকস্মাৎ দুলালের প্রাণের কোমল তন্ত্রীতে ঝড় তুলে দিয়ে গেল। চতুর্দ্দিকের গ্লানি ও একান্ত লজ্জাহীন পারিপার্শ্বিকের দারুণ নিষ্পেষণে যে-দুলাল আপনাকে দিনের পর দিন নরকের পথে ঠেলে নিয়ে চ'লেছিল, সহসা সে দুলালের চোখ গেল খুলে। ব্যথা ও বেদনায় তা'র ভিতরের এতদিনকার নিষ্পেষিত মনুষ্যত্ব বাধাহীন নির্ঝরের মতই ওর প্রাণের দু'কূল প্লাবিত ক'রে ওকে ভাসিয়ে দিল! ও মানুষ! আরো দশজন মানুষের সাথে মানুষের মতই বাঁচবার অধিকার ওরও আছে! নির্ব্বাসিত মানব-দেহে অভিমানী দেবতা আবার বুঝি ফিরে এলেন। ও দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

সহসা কাকামণি সকলের দিকে ফিরে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন ঃ ও কাঁদুক, ওকে কাঁদতে দাও! চল আজ আমরা ফিরি। আর একদিন আবার আসা যাবে!

গলি-পথটা নিঃশব্দে অতিক্রম করে সকলে এসে গাড়ীর কাছে দাঁড়াল!

নিশীথের আকাশ মেঘে তখন আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে কালো আকাশের বুক চিরে সোনালী বিদ্যুতের ইসারা জেগে উঠে। চারিদিকে একটা ঠাণ্ডা বাতাস আসন্ন বৃষ্টির আভাস জানায়। আপাদমস্তক একটা চাদরে ঢেকে গাড়ীর চালের উপর আব্দুল বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কাকামণি ডাকলেন: আব্দুল! আব্দুল!…কাকামণির ডাকে আব্দুল উঠে বসল।

গাড়ীতে উঠ্তে উঠ্তে কাকামণি বললেন: বৃষ্টি আস্ছে, প্রফুল্লটা আবার না ভেজে!…

খিদিরপুর ব্রিজ ছাড়বার পরই ঝম্ ঝম্ করে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামল। গাড়ীর খড়খড়ি তুলে দেওয়া সত্ত্বেও এক একটা বৃষ্টির প্রবল ঝাপটা গাড়ীর সব কয়টি আরোহীকেই প্রায় ভিজিয়ে দিচ্ছিল। বৃষ্টির সাথে সাথে আবার প্রবল হাওয়া। খড়খড়িটা ফাঁক করে চীৎকার করে কাকামণি বললেন: আব্দুল, একটা বড় গাছের তলায় কিছুক্ষণ গাড়ীটা রাখ। কিন্তু গাড়ীর টিনের চালে প্রবল বারিপাতের ঝম্ ঝম্ শব্দ তাঁর গলার শব্দকে অচিরে কোথায় ডুবিয়ে দিলে।

অতিকষ্টে সকলে এসে আমিতাদের গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীতে পৌঁছাল। কাকামণি সকলকে ভিজা কাপড়-জামা ছেড়ে শুক্‌নো কাপড়-জামা পরবার জন্য আদেশ দিয়ে নিজের ঘরের দিকে চল্লেন। অবিশ্রান্ত বারি পতন ও প্রমত্ত বায়ুর হাহাকার তখনও সমানে চলেছে।

লম্বা টানা বারান্দার এক কোণে কাকামণির ঘর। ঘরের সামনেই একটা আম কাঠালের বাগান।…

কাকামণির ঘরখানি বেশ বড়।…ঘরের এক কোণে তিন চারটে কাঁচের আলমারী নানা জাতীয় ইংরাজী ও বাঙলা বইয়ে ঠাসা। এক ধারে একটি তক্তপোষের উপর পুরু একখানি কম্বল পাতা, মাথার ধারে ছোট্ট একটি বালিশ। শয্যার আর কোন বাহুল্যই নাই। মাথার ধারে ছোট্ট একটি টেবিল।…একখানি টুল, তাতে একটি হরিণের চামড়া পাতা…এবং তারই সন্নিকটে একখানি ইজিচেয়ার। একপাশে কাঠের আলনায় খান-দুই কাপড় কোঁচান। দেওয়ালের এক কোণে একটা বেহালার বাক্স দাঁড় করান।

সারাটা পথ বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে প্রফুল্ল যখন গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীর দরজার কাছে এসে পৌঁছুল, রাত তখন প্রায় দেড়টা।… কড়া নাড়তেই রঘু দরজা খুলে দিল।

সোজা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে প্রফুল্ল কাকামণির ঘরের দিকে অগ্রসর হলো।

এই কিছুক্ষণ হলো বৃষ্টিটা বুঝি থেমেছে।…ক্ষান্তবর্ষণ আকাশের গায়ে তখনও মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গাছের পাতায় পাতায় হাওয়ার দোলন লেগে বৃষ্টির ফোঁটা তখনও টুপ্-টাপ্ করে ঝরছে।

ভিজে বারান্দায় পা টিপে টিপে প্রফুল্ল এগিয়ে চললো। সহসা একটা করুণ সুরের রেশ প্রফুল্লর কানে এসে লাগলো। কী করুণ সে সুর! যেন লক্ষ কোটী মানবের দুঃখ ও বেদনা এই প্রাণমাতানো সুরে রূপান্তরিত হয়ে আঁধার ধরিত্রীকে আনন্দে মাতিয়ে তুলছে।

---

# সাত

সুরমুগ্ধ প্রফুল্ল পায়ে পায়ে চলতে চলতে এসে কাকামণির ঘরের ভেজান দুয়ার ঠেলে ঘরের মধ্যে যেখানে টুলের উপর বসে কাকামণি একমনে বেহালার গায়ে ছড় টেনে চলছিলেন, ঠিক তার পিছনটিতে এসে দাঁড়াল। টেবিলের উপর সবুজ ঘেরটোপের ভিতর হতে একটা মৃদু নরম আলোয় ঘরের মাঝে আলো-আঁধারের অপূর্ব্ব সমাবেশ। কখন এক সময় বেহালা থেমে গেছে প্রফুল্ল মোটেই তা জানতে পারেনি, কাকামণির স্পর্শে ওর সম্বিৎ ফিরে এল।

ঃ এস প্রফুল্ল, এ জামা-কাপড়গুলো ছেড়ে একটা শুক্‌নো কাপড় পর।···আলনা হতে একটা কাপড় এনে কাকামণি তা'র হাতে তুলে দিলেন। পাশের সেল্‌ফ্‌ হতে একটা ছোট শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা ব্রাণ্ডি একটা কাচের গেলাসে ঢেলে প্রফুল্লকে খাইয়ে দিলেন।

ঃ আমার বিছানায় শুয়ে পড়।···

প্রফুল্ল ভিজা কাপড়-জামা ছেড়ে বিনা বাক্যব্যয়ে কাকামণির বিছানাতেই গা ঢেলে দিল। তা'র মাথার বিপর্য্যস্ত চুলে আঙুল চালাতে চালাতে মধুরস্বরে কাকামণি বললেনঃ সোনাকে পুড়িয়ে যেমন খাঁটি করতে হয়, তেমনি ভগবানও আমাদের দুঃখের ভিতর দিয়ে সত্য ও সুন্দরের পথে টেনে নিয়ে যান।···সংসার-পথে

চলতে চলতে মাঝে মাঝে আমরা বিপথে গিয়ে পড়বই। পথের দুঃখ কষ্ট ? সে ত থাকবেই, তাই বলে ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেমে থাকলেই পথটা ফুরুবে না…

রাত প্রায় ফুরিয়ে এল। আকাশের অন্ধকার অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে রাত-জাগা পাখীদের ডানা নাড়ার শব্দ। কাকামণি ডায়েরীর পাতায় ঝুঁকে পড়ে একমনে লিখে যাচ্ছিলেন ঃ

—বড় ছেলেমানুষ ওরা।…

সংসারের দ্বেষ-হিংসা, খলতা ও নীচতা দেখে প্রফুল্ল কত বড় আঘাতই না আজ পেল। কিন্তু আঘাত আরও চাই। আঘাতের পর আঘাত হেনেই আজ জাগাতে হবে দেশের কিশোর ও তরুণের দলকে। এক হাতে মুছ্‌তে হবে চোখের জল, অন্য হাত তুলবে প্রতিকারের জন্যে। মানুষের দুঃখ-বেদনার চরম ছবি দেখে যেদিন ওরা হাসতে শিখবে, এ দুনিয়ায় বাঁচা ও মরার সার্থকতা যেদিন ওদের কাছে সমান হবে—সেদিন,…হাঁ সেদিন জান্‌বো ওরা সত্যিকারের কৈশোর ও সত্যিকারের তারুণ্যের দাবী করতে পারে। কবে ? কবে সেদিন আসবে ?…আর কত দূরে ?

—জাগো সকলে ! অমৃতের অধিকারী তোমরা জাগো !

… .... ....

প্রফুল্লর ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

অন্ধকারের বুকে ভোরের প্রথম আলোর রাঙা আভাস। কাকামণি ঘরের মধ্যে একমনে পায়চারি করছেন আর গুন গুন করে গাইছেন।

ভারী একটা গেরুয়া রংয়ের খদ্দরের চাদরে গা ঢাকা। এই অল্পক্ষণই হবে বোধকরি স্নান ক'রে এসেছেন। কপালে দুই ভ্রূর ঠিক মাঝখানে একটি রক্তচন্দনের তিলক। কি সুন্দরই দেখাচ্ছে কাকামণিকে!

প্রফুল্ল মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল। পরক্ষণেই কি ভেবে ধড়ফড় করে শয্যা ছেড়ে উঠে কাকামণির পায়ের উপর প্রণাম করলে।

কাকামণি প্রথমটা একটু চম্‌কে গেছলেন, পরক্ষণেই দুই হাত বাড়িয়ে অসীম স্নেহে প্রফুল্লকে আপনার বিশাল বুকের 'পর টেনে এনে মৃদুমধুরকণ্ঠে বললেনঃ ওরে আমার রূপকথার রাজকুমার···

ঃ কাকামণি!···কাকামণির বিশাল বুকের 'পর মুখ গুঁজে প্রফুল্ল ডাকলে।

ঃ সবল, সুস্থ ও বিকারহীন হোক অন্তর তোমার!

প্রভাতের প্রথম সোনালী আলো পূর্ব্বাকাশের মেঘের তোরণ খুলে খোলা বাতায়নপথে উঁকি দিল। ভোরের হাওয়া শির শির করে বয়ে গেল। পাখীর কাকলিতে মুখরিত হলো সম্মুখের আম্রকানন!···

প্রফুল্লর দুই চোখের কোণে দু' ফোঁটা জল!

যাদের নিয়ে কাকামণির কাজ তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই কিশোর বয়স এখনও ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারেনি। শুধু অর্জ্জুনলাল, প্রফুল্ল ও অমিয় বয়সে অন্য সকলের চাইতে দু' এক বছর এগিয়ে

গেছে, বোধ করি কৈশোর ও তারুণ্যের প্রান্ত সীমায়। অর্জ্জুনলাল, প্রফুল্ল ও অমিয় বাদে সকলেই স্কুলের ছাত্র।

কথায় কথায় কাকামণি ওদের একদিন বলেছিলেন—'তোমরা একথাটা কখনও ভুলো না যে মানুষ হয়ে মানুষের মাঝে তোমরা এসে জন্মেছ। মানুষ কথাটার মানে শুধু দু'টো হাত, দু'টো পা, একটা মাথা ও এক জোড়া চোখ নয়, মানুষ কথাটার মানে অনেক বড় ও অনেক ব্যাপক। সত্য ও সুন্দরের প্রতিনিধি তোমরা। অমিত শক্তি তোমাদের দুই বাহুতে, দুর্জ্জয় সাহস তোমাদের বুকে।

যা পুরাতন, যা অসুন্দর, যা অন্যায়, যা পাপ—সে সব ভেঙ্গে ফেলে নূতন ক'রে আবার এই শত শতাব্দীর পুরাতন দুনিয়াকে গড়তে হবে। তোমরা মানুষ। মনে রেখো ঃ

'সবার উপরে মানুষ সত্য
তাঁহার উপরে নাই।'

তারপর যেদিন তিনি সকলের হাতে রাঙা সুতার রাখী বেঁধে দেন সেদিন বলেছিলেন ঃ সামান্য এই রাঙা সুতোর রাখী বেঁধে দিয়ে শুধু আজ তোমাদের সকল কিশোর ও তরুণকে এই কথাটাই বলতে চাই, যে আজ হতে তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের। One for all and all for one এবং তোমরা সকলে দেশের এবং দেশ তোমাদের সকলের।...আজকার এই রাখীবন্ধনের ভিতর দিয়ে তোমাদের সকলের মনে সেই যোগাযোগই গড়ে উঠুক যে, আজ দেশের প্রত্যেক ছেলে তোমাদের ভাই...প্রত্যেক মেয়ে তোমাদের বোন।...

---

# আট

ভোরবেলা যদি কর্ম্মায়তনে কখনও এস, দেখবে—মুক্ত বায়ুতে কর্ম্মায়তনে একদল কিশোর বালক ব্যায়াম করছে এবং অর্জ্জুনলাল ও প্রফুল্ল সকলকে ঘুরে' ফিরে' প্রত্যেকটি ব্যায়ামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। কখন কখন কাকামণিও থাকেন। অল্প দূরেই জাহ্নবী প্রবাহিতা। সূর্য্যের আলোয় ঝক্ ঝক্ করছে। গঙ্গাবক্ষ হতে সুশীতল বায়ু-প্রবাহ মাঝে মাঝে হু হু ক'রে বয়ে যায়। ব্যায়াম শেষ হলে সকলে একটু বিশ্রাম নিয়ে গঙ্গায় যায় স্নান করতে।

তারপর ঘণ্টা খানেক বা ঘণ্টা দেড়েক কাকামণির কাছে ওরা ওদের দৈনিক স্কুলের পড়াটা তৈয়ারী করে নেয়।

তারপর কেউ ঢোকে তাঁত ঘরে, কেউ সূতা-কাটার ঘরে, কেউ লাইব্রেরীতে, কেউ বেত দিয়ে জিনিষ তৈয়ারী করার ঘরে,—কর্ম্মায়তন মুখরিত হয়ে উঠে কর্ম্মের সাড়া পেয়ে। তারপর খেয়ে নিয়ে চলে সকলে স্কুলে। কর্ম্মায়তনের বোর্ডিংয়ের ছেলে ছাড়া আরো অনেক ছেলেই এখানে যাতায়াত করে।

সেদিন রবিবার।

দুপুরের দিকে সকলেরই কাকামণির ওখানে একত্রিত হবার কথা।

শ্যামলকে নিয়ে অর্জ্জুনলাল বাসে উঠ্‌ল। বাসে অত্যন্ত ভিড়। একটু দাঁড়াবার পর্য্যন্ত স্থান নেই।

মৌলালীর মোড় হতে একটা সাহেব ও একটি মেম এসে বাসে উঠ্‌ল।

শ্যামল ও অর্জ্জুনলাল একটা সিটে বসেছিল। স্ত্রীলোক যাত্রী দেখে অর্জ্জুনলাল নিঃশব্দে উঠে নিজের আসনটি খালি করে দিলে। শ্যামল বসেই রইল।

কিন্তু সাহেবটা সহসা হাত বাড়িয়ে শ্যামলের একখানি হাত ধ'রে টেনে তুলে' সহযাত্রিণীকে আকর্ষণ করে তুইটি সিটই অধিকার করে নিল। অর্জ্জুনলাল কিছু বলবার আগেই শ্যামল নিজকে সামলে নিয়ে গম্ভীরস্বরে সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে বললেঃ Clear out my seat, please !

সাহেব যেন শুনতেই পায়নি এমনি ভাব দেখিয়ে ঠোঁটের আগায় ধরা সিগারেটটা ধরাতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল।

: Clear out !··· বাসশুদ্ধ লোক নির্ব্বাক বিস্ময়ে এই সামান্য একটি চৌদ্দ পনের বছরের বাঙালী ছেলের তুর্জ্জয় সাহসের বহরটা দেখতে লাগল।

সহসা সাহেবের কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে ঝাঁকুনি দিয়ে তীব্রস্বরে শ্যামল বললেঃ Don't you hear me!·· you !···

কথাটা সম্পূর্ণ শেষ হবার আগেই সাহেবের প্রচণ্ড একটা ঘুসী শ্যামলের নাসিকা লক্ষ্য করে উদ্যত হলো, কিন্তু সে ঘুসী যথাস্থানে পৌঁছবার বহুপূর্ব্বেই অর্জ্জুনলালের বজ্রমুষ্টির এক হেচ্‌কা টানে সাহেব কাৎ হয়ে পিছন দিকে টলে পড়ল।

সাহেবটা ঠিক হয়ে দাঁড়িয়েই আক্রমণকারীকে লক্ষ্য ক'রে তা'র কপালের 'পর বসালে এক ঘুসী।...

লোহার মত শক্ত একটা ঘুসী সাহেবের চোয়ালের উপর পড়ে রক্তাক্ত মুখে তা'কে তখনই ছিট্‌কে ফেলে দিল।

বাসের মধ্যে একটা ভীষণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হলো। কণ্ডাক্‌টার ঘুন্টি বাজিয়ে বাস দিলে থামিয়ে।

বাস থামতেই এক হাতে রক্তাক্ত চোয়ালটা চেপে ধ'রে অন্য হাতে সহযাত্রিনী মেমের হাত ধ'রে সাহেব নেমে গেল বাস হতে। শ্যামলের হাত ধ'রে অর্জ্জুনলাল আবার স্বস্থানে এসে বসল। বাসশুদ্ধ লোক ঘন ঘন ওদের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। সামান্য ভেতো বাঙালীর এতটা সাহস ও শক্তির পরিচয় সকলকে শুধু বিস্মিতই করেনি—চমৎকৃতও করেছিল যৎপরোনাস্তি।

শ্যামল ও অর্জ্জুনলাল ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল, ঘরের সব কয়টি প্রাণীই এতক্ষণ ওদের আগমন প্রতীক্ষায় ঘন ঘন খোলা দরজাটার দিকে চাইছিল।

ওদের ঘরে প্রবেশ করতে দেখে সকলেই এক সাথে একটা হর্ষ প্রকাশ করলে। আজিকার অধিবেশনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল—অর্থ-সম্পর্কে আলোচনা।

অর্জ্জুনলাল তা'র সন্ধানী দৃষ্টিটা ঘরের চারদিকে ঘুরিয়ে নিল, কিন্তু ঘরের কোথাও কাকামণিকে দেখতে পেল না। ঘরের মধ্যে উপস্থিত ছিল প্রফুল্ল, অমিয়, সুজিৎ ও অমিতা।

ঃ কাকামণি ? কাকামণি কোথায় ? তাঁকে যে দেখছি না ?,

অমিতা বললেঃ বিকালের দিকে একটা জরুরী চিঠি পেয়েই কাকামণি সেই যে বেরিয়ে গেছেন এখনও ফেরেন নি !

ঃ তবে ?—

ঃ কাকামণি বলে গেছেন, তুমি এলেই আমরা সকলে মিলে আলোচনা ক'রে একটা যা হোক কিছু ঠিক করব।···তারপর যদি কিছু অদল-বদল করবার থাকে তিনি এসে করবেন।···

অর্জ্জুনলাল বললেঃ কতকগুলি টাকা আমাদের দু'চার দিনের মধ্যেই অত্যন্ত প্রয়োজন। টাকার অভাবে আমাদের ঘরের ও বাইরের অনেক কাজ আটকা পড়ে আছে। কাকামণির আদেশে আমি এদেশের দু'চার জন ধনীর কাছে গিয়ে কিছু অর্থের জন্য হাত পাতায় তাঁরা কি বলেছেন জান ? তাঁরা আমার মুখের উপর স্পষ্ট বলে দিলেন,—টাকা !···টাকাটা রাস্তার খোলামকুচি নয় যে চাইলেই পাওয়া যাবে। ভালয় ভালয় এখান হতে সরে পড়, নইলে... কিন্তু তাঁরা ভুলে গেছেন যে দেশের এতগুলি টাকা লোহার সিন্দুকে বা ব্যাঙ্কের খাতায় বন্ধ ক'রে রাখার তাঁদের কোন ন্যায়সঙ্গত দাবী নেই। মাত্র কয়েক ঘণ্টার বিলাস-ব্যসনে ওরা যে অর্থ খরচ করেন, সেই অর্থের বিনিময়ে আমাদের দেশের লক্ষ কোটি নিরন্নের দু'মুঠো অন্নের সংস্থান হয়। ···দাম্ভিক ব্রজেন্দ্রনাথ টাকার নেশায় আজ এতদূর অন্ধ হয়ে উঠেছে যে অনায়াসে সে তার ত্রিশ হাজার টাকার গাড়ীখানা চালিয়ে একটা খোঁড়া ভিক্ষুকের বুকের পাঁজড়া ক'খানা গুড়িয়ে দিয়ে গেল। অথচ এ দেশের আইন তাকে বাঁধতে পারবে না।

এদেশের রাজা দেবে তাকে 'নাইট' উপাধি—কেননা তা'র আছে অর্থ, সে ধনী।...

প্রফুল্ল ও অমিয় একই সাথে প্রশ্ন করল: বল কি!—

: হাঁ...আজ সকালে রেণুর ওখানে যাচ্ছিলাম। স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর গাড়ীতে ক'রে ফিরছিলেন নিজে ড্রাইভ করে; হঠাৎ গাড়ীর মোড় ফিরাতে গিয়ে একটা খোঁড়া ভিক্ষুককে চাপা দিলেন। পুলিশ এসে গাড়ী আটকাল—পকেট হতে একটা দশ টাকার নোট বের ক'রে দিতেই পুলিশ একটা দীর্ঘ সেলাম ঠুকে পথ ছেড়ে দাঁড়াল। অথচ সম্পূর্ণ দোষ ছিল আরোহীর—গাড়ী মোড় ফিরাবার সময় সে একটা হর্ণ পর্য্যন্ত বাজায়নি। ভিক্ষুকটার কাছে গিয়ে দেখি সে ততক্ষণ অক্কা পেয়েছে। যে দেশের লোকের কাছে তা'রই একজন দেশের লোকের প্রাণের মূল্য মাত্র দশটি টাকা, সেই দেশের লোকের কাছে মিষ্টি মুখে কাজ আদায় হবে না—হতে পারে না! ঠিক করেছি, শক্ত হয়েই কাজ আদায় করতে হবে।

---

# নয়

রাত্রি তখন খুব বেশী নয়।...

আকাশে নক্ষত্ররাজি মিট্ মিট্ করে জ্বলছে। মনে হচ্ছিল যেন কালো রজনী একটা সোনালী বুটিদার ওড়না জড়িয়ে পড়ে আছে।...

কর্ম্মায়তনের ঘাটে একটা ছোট পান্সী বাঁধা।

এই অল্পক্ষণ হয় গঙ্গায় জোয়ার এসেছে। বাঁধান ঘাটের উপর জোয়ারের জল ছলছলাৎ করে পাড়ে এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে।

ওপাড়ে মিল ও জেটির আলোকমালা অন্ধকারে মিটি মিটি জ্বলছে। মাঝে মাঝে দু' একটা ষ্টীমার বা লঞ্চ গঙ্গাবক্ষে আলোড়ন জাগিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে। ঢেউগুলি এসে নৌকার গায়ে ভেঙ্গে পড়ছে। প্রফুল্ল, অর্জ্জুনলাল ও পরাণ মিঞা নিঃশব্দে এসে পান্সীর উপর উঠে, নোঙর তুলে পানসী ভাসিয়ে দিল।

অন্ধকারে জলের বুকে দাঁড় ফেলার ছপ্ ছপ্ শব্দ গঙ্গার একটানা কুলু কুলু শব্দের সাথে মিশে যায়। ঢেউয়ের তালে তালে পান্সী দোদুল দোলায় দোলন খায়।

ছোট গঙ্গার মুখে এসে অর্জ্জুনলাল শুধাল : ফিরবার পথে জোয়ার থাকবে, তখন ফিরতে একটু কষ্ট হবে না মিঞা ?

: তা একটু হবেক কর্তা।

প্রফুল্ল বল্লে : চিন্তার কথা বটে।

তখন গভীর রাত্রি।

নৌকা ব্রজেন্দ্রনাথের প্রাসাদোপম বিশাল অট্টালিকার পিছনে এসে লেগেছে। অন্ধকারে ব্রজেন্দ্রনাথের অট্টালিকা ঘুমন্ত পাষাণ-পুরীর মতই প্রতীয়মান হচ্ছে।

একটা টর্চ্চ হাতে অর্জ্জুনলাল একা বাগানের প্রাচীর টপ্‌কে বাড়ীর পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালো। এ বাড়ীর প্রতিটি অলিখুঁজি পর্য্যন্ত অর্জ্জুনলালের নখদর্পণে। বাগানের ভিতর একটা ঘোরান লোহার সিঁড়ি বরাবর ত্রিতলে গিয়ে উঠেছে। তারপরই প্রকাণ্ড একটা টানা বারান্দা। বারান্দার শেষ প্রান্তে ব্রজেন্দ্রনাথের প্রাইভেট রুম।

অর্জ্জুনলাল জানে, সেই প্রাইভেট রুমের এক কোণে ব্রজেন্দ্রনাথের দেওয়াল আলমারীতে নগদ খরচের জন্য যে টাকা মজুত থাকে, সেটা চার সহস্রেরও অধিক অঙ্কের কোঠা পেরিয়ে যায়।

সিঁড়ি বেয়ে অর্জ্জুনলাল বারান্দায় বদ্ধ দরজাটার সামনে এসে উঠল।···সরু কার্ণিশ ঘেঁষে ঘেঁষে অতি সন্তর্পণে প্রথম খোলা জানলা পথে সে এক লাফে বারান্দায় গিয়ে পড়ল। বারেকের জন্য সন্ধানী খরদৃষ্টি নিয়ে অর্জ্জুনলাল অন্ধকার বারান্দার এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত দেখে নিল। এ যেন এক জনহীন পাষাণ-পুরী, কোন্ রূপকথার যুগের।

পা টিপে টিপে অর্জ্জুনলাল ব্রজেন্দ্রনাথের শয়ন ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

সে জানত ব্রজেন্দ্রনাথের মাথার দিকে একটা পিতলের হুকে প্রাইভেট রুমের চাবীটা টাঙ্গানো থাকে। ঠিক পাশের ঘরেই

রেণু ঘুমায় বলে ব্রজেন্দ্রনাথ নিজের ঘরের দরজটা চিরকালই ভেজিয়ে রাখতেন।

অর্জ্জুনলাল দরজা ঠেলতেই সেটা খুলে গেল।

অন্ধকার ঘর।...পালঙ্কের উপর গভীর নিদ্রায় মগ্ন স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ।

নিশীথের চোরা বায়ু নিঃশব্দে মুক্ত জানালা পথে এসে নেটের মশারীটাকে দোলাচ্ছিল।

অর্জ্জুনলাল নিঃশ্বাস চেপে অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। পায়ে পায়ে এগিয়ে নিঃশব্দে হুক হতে সে চাবীর রিংটা তুলে নিল।...

প্রথম দুটো চাবীর পর তৃতীয় চাবিটা তালার মুখে দিয়ে ঘোরাতেই খট্ করে একটা শব্দ হয়ে দরজার ভারী কবাট দুটো ফাঁক হয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে ঢুকে অর্জ্জুনলাল পিছন হতে দ্বারটা ভেজিয়ে দিল। পকেট হতে টর্চ্চটা বের করে বোতাম টিপে একবার সমস্ত জায়গা ভাল করে দেখে নিল।

ড্রয়ারে চাবী লাগিয়ে চাবী ঘুরাতেই ড্রয়ার খুলে সামনের দিকে সরে এল।...

ড্রয়ারে ছিল গা-আলমারীর চাবী।

চাবী হাতে গা-আলমারী খুলতে গিয়ে অর্জ্জুন দেখলে ব্যাপারটা সে যত সহজ ভেবেছিল, আসলে সেটা কিন্তু তত সহজ নয়।...

আলমারীর চাবীটার নির্দ্দেশ ছিল কতকগুলি সাঙ্কেতিক সংখ্যার সমষ্টি দিয়ে। সেই সংখ্যা আলমারীর গায়ে এলোমেলোভাবে

সে তাড়াতাড়ি চাবী ও আলমারীর ফুকরের - মিলাবার চেষ্টা করল—

পৃঃ ৩৯

খোদা ছিল,—এক ব্রজেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ তা খুলতে জানত না।···

অর্জ্জুনলাল একই আলমারীর গায়ে পাশাপাশি এতগুলি সংখ্যা-খোদিত চাবীর ফুকর দেখে হকচকিয়ে গেল। কিন্তু দমবার ছেলে সে নয়।···অর্জ্জুনলালের কপাল বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগল।

কিন্তু টাকা! টাকা যে তাদের চাই-ই।···যেমন করে হোক।···

আর এতদূর এসে শূন্য হাতে ফিরে যাওয়া—? অসম্ভব···

সে তাড়াতাড়ি চাবী ও আলমারীর ফুকরের সংখ্যাগুলো মিলাবার চেষ্টা করল।

সহসা দুটো সাড়াসীর মত কঠিন হাতের চাপ ওর দুই কাঁধের উপর এসে পড়ল, এবং পরক্ষণেই বাজের চীৎকারের মত একটা তীক্ষ্ণ খলখলে হাসি রজনীর সুগভীর নিস্তব্ধতার বুকে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

আচমকা অর্জ্জুনলালের হাত হতে টর্চ্চটা মাটিতে পড়ে নিভে গিয়ে সমস্ত ঘরটা নিশ্ছিদ্র আঁধারে ভরে গেল।

অর্জ্জুনলালের মনে হল, সেই ভয়াবহ হাসির তীব্রতা যেন তখনও ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে খল্ খল্ করে ফিরছে।···শত শতাব্দীর ক্ষুধিত আত্মা আজ যেন আঁধার রজনীর বুকে নিষ্ঠুর পৈশাচিকতায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে।···

---

# দশ

সেই ভীষণ হাসির উদ্দামতা ধীরে ধীরে নিভে এলো।

ঘটনার আকস্মিকতায় কয়েক মুহূর্ত্ত অর্জ্জুনলাল প্রথমটায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু সে খুব অল্প সময়ের জন্য···পরক্ষণেই সে আপনাকে আক্রমণকারীর লৌহমুষ্টির নিষ্পেষণ হতে মুক্ত করার জন্য একটা প্রবল ঝটকা দেবার চেষ্টা পেল, দেহের সবটুকু শক্তিই প্রয়োগ করল···কিন্তু বৃথা···সেই দানবীয় মুষ্টি তাতে এতটুকুও শিথিল হলো না। বরং আবার একটা প্রাণখোলা উচ্চহাসির শব্দ অন্ধকারের মধ্যে খল্ খল্ করে উঠলো: তুমি ত' তুমি!...এই এক হাতে নেপালের মহারাজার দু'দুখানা দামী গাড়ী টেনে ধরেছিলাম, গাড়ী এক আঙ্গুলও নড়েনি! কিন্তু সেও ত শোনা কথা মাত্র। অতএব চাক্ষুষ একটা প্রমাণ থাকা ভবিষ্যতের পক্ষে ভাল।...আচমকা অর্জ্জুনলালের ঘাড়ের ওপর এক হাত দিয়ে, অন্য হাতে একটা পা ধরে চক্ষের নিমিষে শিশু যেমন তার খেলার বল নিয়ে লোফালুফি করে, তেমনি অর্জ্জুনলালকেও বার দুই তিন শূন্যে লোফালুফি করে ঝুপ করে নামিয়ে দিয়ে কে যেন বলল: ঐ সামনের চেয়ারটায় বস। সঙ্গে সঙ্গে সুইচ বোর্ডে খট করে শব্দ হল, জ্বলে উঠলো তীব্র আলো।

মুহূর্ত্তে ঘরের ঘুটঘুটে অন্ধকারটা যেন হুড়মুড় করে খোলা জানালা-পথে চক্ষের নিমেষে উধাও হয়ে গেল।

অর্জ্জুনলাল দেখল, সামনেই দাঁড়িয়ে খালি গায়ে স্বয়ং স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ!

স্যার ব্রজেন্দ্রনাথের দেহসৌষ্ঠব শুধু সুন্দরই নয়, অপূর্ব্ব। লম্বিত শালশাখা সম বলিষ্ঠ বাহু! পেশল চওড়া বক্ষ! দীর্ঘ ছয় ফিটের উপর লম্বা!...সমগ্র দেহের সুস্পষ্ট উন্নত মাংসপেশী হতে যেন আসুরিক শক্তি উঁকি দেয়। অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় মনে হ'ল, এ যেন কোন রূপদক্ষ শিল্পীর হাতে পাষাণ কুঁদে গড়ে তোলা এক গ্রীক মূর্ত্তি। বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অর্জ্জুনলালের চোখের পাতা দুটি নত হয়ে এল...হঠাৎ ও চমকে উঠল।...

: অর্জ্জুনলাল, সিংহের গহ্বরে তুমি হানা দিয়েছ!...এবং এসেছো যখন দু' একটা থাবার চিহ্ন না নিয়েই কি তোমায় যেতে দেব?... রেণুর কাছে তুমি যখন যাতায়াত করতে—তোমায় ঠিক চিনিনি। কিন্তু এও আমি স্বীকার করছি, একমাত্র তুমি ছাড়া ব্রজেন্দ্রনাথের লোহার সিন্দুকের কাছে এসে দাঁড়াবার সাহস এই পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় প্রাণীর আছে কিনা সন্দেহ!...কিন্তু তুমি জান না,... দিনের পর দিন বিন্দু বিন্দু করে বুকের রক্ত ঢেলে কেমন ক'রে আজকার এই সুবিপুল অর্থ আমায় সঞ্চিত করতে হয়েছে! আমার যত অর্থ আছে তা দিয়ে তোমাদের একটা সঙ্ঘকে কেন, গোটা একটা রাজ্যকেও ধূলার মতই রেণু রেণু ক'রে হাওয়ার বুকে উড়িয়ে দেওয়া যায়!...এবং সেই অর্থ এমন-সব স্থানে লুকান

আছে যে তুমি ত তুমি, তোমার মত আরো দশটা অর্জ্জুনলালের সারাটা জীবনও যদি কেটে যায়—সেই অর্থ খুঁজে বের করতে পারবে না। কিন্তু সে কথা যাক !...তুমি যাতে কোন দিন ভবিষ্যতে আর এমনি করে আমার ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটাতে আস তার একটা বন্দোবস্ত এখনই করে রাখতে হয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ অল্প একটু মৃচকি হেসে একটা টানার ভিতর হতে প্রকাণ্ড দড়ি বের করলেন।

ঃ চুপটি ক'রে বসে থাক তো! গোলমাল করো না !...শক্তির পরিচয় ত আমার আগেই পেয়েছো !...

অর্জ্জুনলালের হাত পা সেই শক্ত দড়ি দিয়ে বেশ করেই বাঁধা হলো। তারপর সেই বাঁধা অবস্থায় ছোট্ট একটা বোঁচকার মত অর্জ্জুনলালকে কাঁধে ফেলে ব্রজেন্দ্রনাথ নিঃশব্দে নীচে গ্যারেজের সামনে এসে দাঁড়ালেন! পকেট হতে চাবী বের করে—গ্যারেজের গেট খুলে বাঁ হাত দিয়ে টেনে গাড়ীটাকে বাইরে নিয়ে এলেন।

গাড়ীর সামনের সিটেই, নিজের পাশে অর্জ্জুনলালকে বসিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলেন।...নৈশ অন্ধকার...হেড্‌লাইটের আলো ফেলে গাড়ী ছুটে চলল।

জনবিরল রাজপথ যেন ঘুমন্ত এক অতিদীর্ঘ অজগরের মত গা এলিয়ে পড়ে আছে !...কালো কুচ্‌কুচে পীচ ঢালা রাস্তা। মাঝে মাঝে গ্যাস-পোষ্টগুলি যেন শ্রান্ত পদাতিকের মতই দীর্ঘপথ হেঁটে এসে যাত্রা স্থগিত করেছে !...

রাস্তার দু' পাশে ঘন সন্নিবেশিত বিশাল কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলির

পত্রাবলি নৈশ বায়ু-হিল্লোলে সর সর শব্দ করছিল।...শেষ ওভারব্রিজ পেরিয়ে গাড়ী তখন কতকটা ফাঁকা রাস্তার উপর এসে পড়ল !...

গাড়ীর ভিতরের আলোয় অর্জ্জুনলাল স্পিড মিটারটার দিকে তাকিয়ে দেখলে, কালো নিডিলটা থর থর করে ৫০ ও ৫৫ ঘরের গায়ে কাঁপছে !...হু হু করে প্রবল বায়ুর ঝাপ্‌টা নাকে চোখে মুখে এসে শ্বাস রোধ করতে চাইছে ! রাস্তার পাশের বড় বড় বাড়ীগুলি আঁধারে ছায়ার মতই গাড়ীর গতিবেগের সাথে সাথে দুই পাশে ছিট্‌কিয়ে পড়ছে। মাথার উপর রাত্রির আকাশ তারার ওড়না জড়িয়ে নিদ্রালু চোখে যেন পড়ে আছে !...

গাড়ী চলেছে নিঝুম ঘুমভারানত ধরিত্রীর বুকের উপর দিয়ে অবাধ বিরামহীন গতিতে কোন্ সুদূর যাত্রা-পথে কে জানে ? ক্রমে চৌরঙ্গি, কলেজ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, সব কিছু পেরিয়ে অবশেষে বরাহনগরের সুপ্রশস্ত রাস্তার 'পরে এসে পড়ল। দু'পাশে বড় বড় পাটের গুদাম, ছোট ছোট খোলার ঘর ; খাটিয়া বিছিয়ে কুলিমজুররা অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে !···শেষটায় গাড়ী এসে দাঁড়াল প্রকাণ্ড পুরাতন অর্দ্ধভগ্ন এক গুদাম ঘরের সামনে।

অর্জ্জুনলালকে কাঁধে ফেলে, ব্রজেন্দ্রনাথ প্রকাণ্ড লোহার গেটের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

হাত দিয়ে ঠেলতেই একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ আর্ত্তনাদে গেট্‌টা খুলে গেল। জঙ্গলাকীর্ণ অপ্রশস্ত একটা উঠান। অন্ধকারে মাথার উপর দিয়ে একটা নিশাচর পাখী ঝট্‌পট্ করে উড়ে গেল !

এ বুঝি কোন শতাব্দীর পুরাতন কবরখানা !···

হাতের টর্চ্চ জ্বেলে ব্রজেন্দ্রনাথ এগিয়ে চললেন।···প্রকাণ্ড একটা টানা হলঘর।··· একটা ভ্যাপ্‌সা দুর্গন্ধ,···বায়ুলেশহীন নিষ্কম্প আঁধারে যেন থম্‌ থম্‌ করছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ চলতে চলতে একটা লোহার কবাটের কাছে এসে দাঁড়ালেন। দরজাটার গায়ে একটা লোহার মোটাপাত দরজার মাথা থেকে নীচ পর্য্যন্ত বসান। কোমর হতে চাবী বের করে সেই লোহার পাতের গায়ের একটা ছিদ্রের মধ্যে চালিয়ে মোচড় দিতেই পাতটা আলগা হয়ে এল।

ব্রজেন্দ্রনাথ হাত দিয়ে টেনে দরজার গা হতে লোহার পাতটা খসিয়ে আনলেন। জোরে গোটা দুই ধাক্কা দিতেই, দরজার ভারী কবাট দু'টো ফাঁক হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ নাকে মুখে এসে ঝাপটা দিলে। নিদারুণ অন্ধকারাবৃত এ যেন কোন্‌ মৃতপুরীর দ্বার মুখ ব্যাদান করে রয়েছে!···

ঃ বেশী দিন নয়, মাত্র একটা দিন ও দুটো রাত্রি···ব্যাস্‌, তার-পরেই মুক্তি!···তাহলে বুঝতে পারবে ব্রজেন্দ্রনাথের অর্থের দাম কত। আমার রাজত্বে থানা-পুলিশের প্রহসনও যেমন নেই,···সেই অজুহাতে লঘুপাপের গুরুদণ্ডও নেই। ক্ষুধার খাবার আমিই দিয়ে যাবো,···কিন্তু জলের প্রয়োজন হতে পারে।—বলতে বলতে একটা জল ভর্ত্তি মস্ত বড় ফ্লাস্ক দেখালেন।—এতেই হয়ে যাবে। এই টর্চ্চটাও দিচ্ছি। ব্রজেন্দ্রনাথ তারপর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে টর্চ্চটা অর্জ্জুনলালের হাতে দিয়ে তাকে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিলেন ঃ যাও দুটো রাত একটা দিন বইত নয়!···ক্যাঁচ ক্যাঁচ আর্ত্তনাদ করে লোহার কপাট বন্ধ হয়ে গেল।

*নিশ্ছিদ্র আঁধার। ···সীমাহীন ···জমাট-ভারী ···অন্ধকার! ···এ দুনিয়ার যেখানে যত আঁধার ছিল, সব যেন এখানে এসে একত্রে জট্ পাকিয়েছে। দম আট্‌কে আসে,···পিপাসায় কণ্ঠতালু শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসে!···মাথাটা যেন কেমন এক অস্বাভাবিক অসোয়াস্তিতে ঝিম্ ঝিম্ করে!···আস্তে আস্তে অর্জ্জুনলাল যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেইখানে থপ্ করে বসে পড়ল!···

প্রথম হতে শেষ পর্য্যন্ত আগাগোড়া সমগ্র ব্যাপারটা সে ভাল করে ভাববার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু সবই যেন কেমন সূত্রবিহীন···আবছা আবছা···গোলমেলে!···ভাবা হয়ত বা যায়, কিন্তু সর্ব্ব কিছু একত্রে জোড়া দেওয়া যায় না!···যেন এতক্ষণ ধরে একটা প্রবল ঝড়ের ঝাপ্‌টা ওকে ওলট্-পালট করে দিয়ে গেল। হতচকিত ও মুহ্যমান হয়ে গেছে সে! যেন কেমন একটা ঘুমক্লান্ত জড়িমা ওর সর্ব্বাবয়ব বেয়ে শির শির করে ওর দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যাচ্ছে।

না!···কিছুই আর সে ভাবতে পারে না!...

কোথায় ছিল, কোথায় এল!···এতক্ষণ কী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাত্র একটা স্বপ্নই দেখছিল? দু'হাতে অর্জ্জুনলাল মাথাটা চেপে ধরল।

---

# এগারো

কাকামণি অস্থির পদে ঘরময় পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন।...

তার সদ্য লিখিত ডায়রীর পাতা খোলা—

—ছিঃ ছিঃ! অর্জ্জুন একি করলে?...আমার সোণার স্বপ্ন এমনি করে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলে! কি করে ওর মাথায় এ মতলব এল? বাতুলতা ছাড়া আর কী!...এর বিরাট ফাঁকিটা যে দু'দিনেই ফাঁক হয়ে বেরিয়ে পড়বে! বালুর প্রাসাদের মতই যে একটি মাত্র ঢেউয়ের ঝাপ্‌টাতেই মুহূর্ত্তে বালুতেই মিশিয়ে যাবে!...

—সত্যের প্রতিষ্ঠা,...ন্যায়ের স্থাপনা,...সে কি কখনও অন্যায় ও অসত্যের শিকড় নিয়ে দাঁড়াতে পারে?...আজকার এই অন্যায়,... এই ভুল,...এই অসংযমের সকল ইতিবৃত্তের সত্যিকারের গোড়ার কথাই তাই!...এ কথা কী সে আজও বোঝে নি?...অর্জ্জুনলাল!... হে প্রিয়তম শিষ্য আমার!...

কাকামণি ঘরের কোণ হতে বেহালাটা তুলে নিলেন!... ধীরে ধীরে তারের গায়ে ছড় টানতে লাগলেন!...

নৈশ নিস্তব্ধতায় সুর সীমাহীন মুখরতায় প্রাণ পেল। মনের ভিতর যখন দ্বিধা-সঙ্কোচ জট পাকিয়ে তোলে, এমনি করে সুরের মাঝে আপনাকে বিলিয়ে দিয়েই যেন কাকামণি আপনাকে আড়াল করে রাখতে চান...চান আপনাকে ভুলতে।

অনেকক্ষণ ধরে একটানা বাজিয়ে বাজিয়ে শেষটায় এক সময় শ্রান্ত হয়ে কাকামণি বেহালাটা কোলের পরে নামিয়ে রাখলেন।

রাত্রিও যেন আর বেশী নেই, শেষ হয়ে এলো বুঝি!···মুক্ত বাতায়ন পথে রাত্রি-শেষের শিরশিরে হাওয়া জাগরণ-ক্লান্ত চোখ-মুখে একটা সুস্নিগ্ধ পরশ দিয়ে গেল।

ঃ কাকামণি?

ঃ কে রে?···অমু?···

বাঁ হাত দিয়ে গভীর স্নেহে কাকামণি অমিতাকে কোলের কাছটায় টেনে নিলেন। অমিতা কাকামণির কাছে আরো একটু ঘন হয়ে এসে ওর মাথার চুলগুলি আঙ্গুল দিয়ে টেনে টেনে দিতে লাগলো।

ঃ ঘুম বুঝি হলো না!—এর মধ্যেই উঠে এলি মা? তারপর একটু থেমে বললেন, মানুষের মন এমনিই বটে,—পরকে ঠকাতে গিয়ে আপনিই ঠকে মরবে—অথচ আসল গলদটুকু যে কোথায় তার খোঁজ কিছুতেই নেবে না। আমরা মোহের বশে অনেক সময়ই নিজের গণ্ডি ছাড়িয়ে, যে দুঃখ ছিল না তাকেই টেনে নিয়ে আসি; ফলে এই হয় যে, যেটুকু সত্যিকারের সম্ভাবনা ছিল তাও হারিয়ে বসি।

ঃ কিন্তু অর্জ্জুনলালের এ কাজটা কী সত্যিই ভুল কাকামণি?

ঃ ভুল নয়? নিশ্চয়ই ভুল। সত্যিকারের বড় কিছু করতে হ'লে চাই সাধনা, চাই তিতিক্ষা। ভেবে দেখ আগেকার যুগে মুনি-ঋষিরা সাধনার দ্বারা ভগবানকে লাভ করতেন, তাঁরাও যেমন

রক্ত-মাংসের গড়া মানুষ ছিলেন, তোমরাও ত' সে রক্ত-মাংসে গড়া মানুষই। তাদেরও যেমন চারটে হাত পা, এক জোড়া চোখ ছিল, তোমাদেরও তাই আছে ; তবে তাঁরা যা পারতেন বা পেরেছেন, তোমরাই বা তা পারছ না কেন ? একথাটা কোন দিন একবারও, ভেবে দেখেছ কি তাঁদের যে সাধনা, যে তিতিক্ষা ছিল, তা তোমাদের নেই। তোমরা ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভ করতে চাও। কিন্তু তাতে ত হবে না। যে জিনিষটা ধনিকশ্রেণী এত দিন ধরে একচেটিয়া ভোগ করে এল, এবং বর্ত্তমানেও করছে, এটাও তা'রা একদিনে সংগ্রহ করতে পারে নি, এর জন্য তাদের অনেক সইতে হয়েছে, অনেক চেষ্টা করতে হয়েছে এবং আজ সেটা তা'রা তোমাদের মুখের দু'একটা হুমকি শুনেই ছেড়ে পালাবে, কেমন করে এ তোমরা মনে কর ? আজ যদি কেউ এসে তোমার এতদিনকার বাড়ীটা ছেড়ে চলে যেতে বলে, তুমি কি তা ছেড়ে চলে যাবে মা ? একটা সামান্য পিঁপড়েকেও যদি তুমি তার বাসা হতে তাড়াতে যাও, তবে সে এমন কামড় দেবে যে, তুমি সহজেই বুঝবে যে কাজটা অত সহজ বা সরল নয় !

ঃ তাই বলে কি মানুষ চেষ্টা করবে না !—ঠকতে ত' হবেই ; তাই বলে কি সে দুঃসাহসী হবে না ? দুরূহ বা কঠিন বলে পিছিয়ে আসবে ?

ঃ দুঃসাহসী, একে তুই সাহসের পরিচয় দেওয়া বলিস্ মা ? দস্যু-তস্করের মত লুকিয়ে গিয়ে আর একজনের তুই সর্ব্বনাশ করবি—এই যদি তোদের চোখে সাহসের পরাকাষ্ঠা হয়, তবে ত

দুনিয়ার সব চাইতে যে দক্ষ চোর—সেই হলো এ দুনিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসাহসী ও বরেণ্য! সহসা কাকামণির গলার স্বরটা যেন কোমল হতে কঠোর হয়ে উঠল : সাহস! দুঃসাহস! পারিস্ যদি সিংহের মত সামনাসামনি বুক ঠুকে গিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে আয়! ভীরু শৃগালের বৃত্তি কেন তোদের? কেন তোরা ভুলে যাস্ কোন্ দেশে তোদের জন্ম? যে বাংলার মাটিতে জন্মেছে প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায়ের মত সোনার ছেলে, যে দেশে জন্মেছে সংযুক্তা, তারাবাঈ, পদ্মিনীর মত মেয়ে, সেই দেশের ছেলেমেয়ে তোরা, তোদের কেন এ হীন প্রবৃত্তি? বাংলার সোনার মাটিতে তোরা যে সব সোনার স্বপন···

ভাবের দোলায় শেষের দিকে কাকামণির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

আঁধারের অবগুণ্ঠন তুলে প্রথম ভোরের রাঙা আলো তখন হেসে উঠেছে। আম্রকানন পাখীর কল-কাকলিতে মুখরিত।

: কাকামণি!

: এস প্রফুল্ল।

কাকামণির ডাকে প্রফুল্ল এসে ঘরে প্রবেশ করল। অনিদ্রায় চোখ দুটি বসে গেছে, সমস্তটা মুখ জুড়ে একটা উৎকণ্ঠার ছায়া।

: অর্জ্জুনলাল ফেরেনি, তা আমি জানি; কিন্তু তা'র জন্য চিন্তারও কোন প্রয়োজন নেই। তোমায় কিন্তু বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

অমিতার দিকে ফিরে বললেন : যাও ত মা অমু, প্রফুল্লর জন্য কিছু খাবার ও এক কাপ গরম দুধ আগে নিয়ে এস।

অমিতা মন্থরপদে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। ক্লান্ত দেহভার বইবার মত ক্ষমতা তখন আর প্রফুল্লর ছিল না। কাকামণির নির্দ্দেশে সে খাটের উপরে বসে পড়ল। সমস্তটা রাত ঠায় নৌকায় অর্জ্জুন-লালের অপেক্ষায় বসে বসেও যখন সে ফিরলে না, প্রফুল্ল তখন একটু বেশী ব্যস্ত হয়ে উঠল। কী হলো অর্জ্জুনের? সে পরাণকে নৌকা নিয়ে জলপথেই ফিরে যেতে বলে নিজে ট্রামে ক'রে তাড়াতাড়ি ফিরে কাকামণিকে দুঃসংবাদটা দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। ক্লান্ত স্বর যেন ফুটতে চায় না। প্রফুল্ল ডাকলে: কাকামণি?

: ভয় নেই প্রফুল্ল, অর্জ্জুনলাল ফিরে আসবে। তা'র জন্য উৎকণ্ঠিত হবার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু সে কথা যাক। এখন ত বুঝলে এ উপায়ে এতদিনকার পাঁক উদ্ধার হতে পারে না। সামনে তোমাদের লোহার প্রাচীর। সে প্রাচীর ভেঙ্গে তোমাদের নূতন পথ তৈরী ক'রে নিতে হবে, এবং সেই প্রাচীর ভাঙ্গতে হলে সব চাইতে আগে যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে সেই লোহার মতই শক্ত ক'রে আগে নিজেদেরে গড়ে তোলা। একটু থেমে কাকামণি আবার বললেন: সারাটা রাত ঘুমাওনি, এখন একটু ঘুমুবার চেষ্টা কর। দেখি তোমার খাওয়ার কতদূর কি হোল।

কাকামণি বেরিয়ে গেলেন।

---

# বারো

বেলা প্রায় দশটার সময় প্রফুল্লর ঘুম ভাঙ্গল। দীর্ঘ চার পাঁচ ঘণ্টা ঘুমুবার পর শরীরটা তখন তা'র প্রায় হালকা বোধ হল। শরীরের সে অসহ্য গ্লানি আর নেই। খোলা জানালা দিয়ে অনেকখানি রোদ এসে ঘর ভরে গেছে। প্রফুল্ল শয্যার উপর উঠে বসল।

দরজাটা ঠেলে অমিতা এসে ঘরে প্রবেশ করল। বলল ঃ ঘুম ভাঙ্গল প্রফুল্ল! আমি এর আগে আরো তিন চার বার এসে উঁকি মেরে গেছি। চল একবার বেড়িয়ে আসা যাক।

ঃ কোথায় ?

ঃ স্যার ব্রজেন্দ্রনাথের ওখানে।

ঃ চল।

কর্ম্মমুখর সহর—অগণ্য নর-নারীর কর্ম্মচঞ্চলতায় অনুরণিত

ওরা দুজনে গিয়ে ট্রামে উঠে বসল। সারাটা পথ কারও মুখেই একটা কথা নেই।

ট্রাম হতে নেমে, বেশ খানিকটা হেঁটে গেলে তবে স্যার ব্রজেন্দ্র-নাথের প্রাসাদ।

মাথার উপর সূর্য্য তখন অগ্নিবর্ষণ করছে। ওরা দুজনে হাঁটতে হাঁটতে স্যার ব্রজেন্দ্রনাথের প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

গেটে বন্দুকধারী শিখ দারোয়ান।

ঃ দিদিবাবু কুঠিমে হ্যায় ?—শুধালে প্রফুল্ল।

ঃ জী হাঁ। যাইয়ে।

প্রশস্ত কাঁকর বিছান পথ। দুই পাশে কেয়ারী করা ফুলের বাগান। দেশী বিদেশী সকল প্রকার ফুলেরই একত্র সমাবেশ। শ্বেতমর্ম্মরের সোপানশ্রেণী। শেষ সোপানের ঠিক মাঝখানে বিশাল এক ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্ত্তি···বলিষ্ঠ এক যুবক এক সিংহের মুখ ব্যাদান করছে।···সামনেই প্রশস্ত হল্ ঘরে সুসজ্জিত বসবার ঘর।···বেয়ারা এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল।···

প্রফুল্ল শুধাল ঃ রেণু দিদি আছে ?···

ঃ আজ্ঞে হাঁ, কলেজে যাবার সময় হয়েছে,···এখুনি নীচে আসবেন।

রেণু এসে ঘরে প্রবেশ করল। প্রফুল্লকে হঠাৎ এ সময় দেখে সোল্লাসে বলে উঠল ঃ একি প্রফুল্লদা, আপনি···হঠাৎ এই অসময়ে। —পরক্ষণেই অমিতার দিকে দৃষ্টি পড়তেই প্রফুল্লর দিকে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে সে তাকাল।

ঃ এ অমিতা !···অমিতার দিকে ফিরে প্রফুল্ল বললে ঃ আর এই রেণু !

ঃ ও আপনি অমিতা দেবী ! রেণু হেসে কাছে এগিয়ে এল। উঃ ! আজ আপনাকে দেখে কি ভালোটাই না লাগছে !···অর্জ্জুনদার মুখে কত দিন আপনার কথা শুনেছি।

ঃ আমার সম্বন্ধে বুঝি অনেক কথা শুনেছো ! কী শুনেছিলে ?— অমিতা বলে একটা অদ্ভুত জীব আছে,···তার ইয়া বড় বড় চারটে হাত—রাবণের মত দশটা মুখ,···এই সব, না ?···অমিতা হাসতে হাসতে জবাব দিলে।

ঃ বাঃ রে আপনি কি দুষ্টু !···অর্জ্জুনদা আপনার কত প্রশংসা করেন। আর আপনি তা'র নিন্দা করছেন !···অমিতার চোখ দুটো ছল ছল ক'রে এল !···

অমিতা এগিয়ে এসে সস্নেহে রেণুকে বুকে টেনে নিলে,—কী ছেলেমানুষ তুমি ভাই !···তোমার অর্জ্জুনদা যে কত ভাল তা কি আমি জানি না।

ঃ সত্যি আমার নিজের একটি দাদা কিংবা ছোট ভাই নেই !···জানি না নিজের মার পেটের ভাই কেমন,···কী ভালটাই যে লাগে আমার অর্জ্জুনদাকে !···বললে রেণু।

ঃ আমিও অর্জ্জুনের মুখে তোমার কথা কত যে শুনেছি !··· কতদিন ভেবেছি এসে তোমার সঙ্গে এক ফাঁকে আলাপ করে যাবো··· কিন্তু হয়েই উঠে না।

ঃ আমার যে কী আনন্দই লাগছে আপনাদের দেখে !···আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, এযে আমি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবিনি।

ঃ কেন ভাই, তুমি একথা ভাবলে ? বোন্ বোনের বাড়ী আসবে না !···আমাদের কাকামণিকে ত তুমি কোন দিন দেখনি, তিনি কি বলেন জান ? তিনি বলেন ঃ

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া ;
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব বুঝিয়া।

পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই—
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লবো বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তা'রে আমি ফিরি খুঁজিয়া ॥”

তুমি যদি সত্যই আমায় তেমনি ক'রে চাওয়ার মত চাইতে, তবে কি আমি এত দিন তোমার কাছ হতে দূরে থাকতে পারতাম ?···আমার যে আসতেই হতো।

ঃ সত্যি আপনি এত ভাল !

ঃ কিন্তু আমায় তুমি কেন 'আপনি' 'আপনি' করছো ভাই ? আমিও ত তোমারই সমবয়সী, আমায় 'তুমি'ই বলো ! 'আপনি'র দূরত্ব ডিঙ্গিয়ে 'তুমি'র কোঠাতেই যখন এসে পৌঁচেছি, তখন আমায়ও তুমি 'তুমি' বলেই কাছে টেনে নাও রেণু ! আমি আর তুমি ত' পৃথক নই ভাই ? আর এই যে তোমার এবং আমার সম্বন্ধ এ ত' একদিনের নয়, এ যে যুগ-যুগান্তের ! আজ না হোক কাল, কিংবা কাল না হয় পরশু একজনকে আর একজনের কাছে যে আসতেই হতো।

ঃ তুমি দাঁড়িয়ে রইলে ভাই অমিতা !···বাঃ রে প্রফুল্লদা, আপনি যে এখনও দাঁড়িয়েই আছেন ? বসুন না ওই চেয়ারটায়। না, তা'র চাইতে চলুন পাশের ঘরে গিয়ে সকলে বসি !···

অমিতা বাধা দিল ঃ তোমার কলেজ ?

ঃ আজ আর যাবো না !···

ঃ যাবে না !···কেন ?···

ঃ বাঃ রে ! তোমরা আমার বাড়ীতে এলে, আর আমি কলেজে যাবো ?···

ঃ ছিঃ ভাই ! তা হয় না। কলেজে তুমি যাও !···কাকামণি বলেন, কোন অজুহাতের দোহাই পেড়ে কর্ত্তব্যে অবহেলা করা উচিত নয়।

ঃ কিন্তু আমার যে আজ সত্যি সত্যিই কলেজে যেতে মোটেই ইচ্ছা করছে না অমিতা। যেন ছোট্ট এতটুকু এক শিশুর মতই রেণুর আব্দার।

অমিতা ওর কথায় হেসে ফেললে,—না চল। আমরা না হয় কলেজ পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে সঙ্গেই যাবো'খন। কিন্তু তার আগে একটা দরকারী কথা আছে।

ঃ কি ?

ঃ অর্জ্জুন কোথায় জান ?

ঃ না।···তিনি ত আজ দিন দশবারো আমাদের এখানে আসেনই না।

ঃ কিন্তু আজ সকালে ?

ঃ না।···কিন্তু হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করছো কেন অমিতা ?

অমিতা অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলে ঃ এমনিই !···

বেয়ারা এসে বললে ঃ দিদিমণি, ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করছে, গাড়ী কি গ্যারেজে তুলে ফেলবে, না আপনি কলেজে যাবেন।···

ঃ না,···কিন্তু,···সে যেন গাড়ী তোলে না, আমি কলেজে যাবো ! চল অমিতা, বেরুনো যাক !

ঃ হাঁ চল !

সকলে এসে গাড়ীতে উঠল।—অর্জ্জুনলাল এখানে নেই তবে সে কোথায় গেল? অমিতা ও প্রফুল্ল চিন্তিত হয়ে উঠ্ল।

বড় রাস্তায় গাড়ী তখন তীব্রগতিতে ছুটেছে।···এস্প্ল্যানেডের মোড়ে রেণুর কাছ হতে বিদায় নিয়ে ওরা গাড়ী হতে নেমে ট্রামে চাপল।

ঃ তোমার কী মনে হয় প্রফুল্ল?

ঃ আমার যেন কেমন সব গুলিয়ে যাচ্ছে অমিতা! কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নেই, কাকামণি বলেছেন, ফিরে সে আসবেই।

ওরা যখন এসে বাসায় পৌঁছাল, বেলা তখন অনেকটা গড়িয়ে গেছে। কাকামণি বোধ হয় ওদেরই অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ঃ এই যে, এ বেলায় না খেয়ে না দেয়ে কোথায় টো টো করতে গেছলে? কেন তোমরা তা'র জন্য ভেবে মরছ? আমি বলছি, সময় হলে সে এক মুহূর্ত্তও দেরী করবে না।

ওরা মাথা নীচু ক'রে ভিতরের দিকে অগ্রসর হলো।

ঃ হাঁ শোন, স্যার ব্রজেন্দ্রনাথের দেখা পেলে?

অমিতা বললে ঃ না। তা'র মেয়ে রেণুর সঙ্গে দেখা হলো।

ঃ ও! আচ্ছা তোমরা যাও!—তার পরই আপন মনে বিড় বিড় ক'রে বলতে লাগলেন ঃ তাকে আটকাবে?···ব্রজেন্দ্রনাথ, তুমি বাতুল!

# তের

বেলা শেষ হয়ে এসেছে।

লম্বা টানা বারান্দায় একটা দোলায়মান চেয়ারে শুয়ে রেণু আনমনে একখানা গল্পের বইয়ের পাতা উল্টে যাচ্ছিল। মনটা তার মোটেই ভাল নেই। তা'র অতি প্রিয় অর্জ্জুনদা যে কোথায় গেল! সে আপন মনেই হু'বার উচ্চারণ করলে, অর্জ্জুনদা, কোথায় আছ ভাই, শীঘ্র এসো, আমরা সকলে তোমার জন্য কত ব্যস্ত হয়েছি, দেখবে এস।

বিদায়োন্মুখ সূর্য্যের শেষ রক্তিমাভ রশ্মিগুলি বারান্দায় স্থাপিত টবের পাম গাছগুলির সরু চিকণ পাতার গায়ে গায়ে ঝিল্‌মিল্‌ করছিল। ভৃত্য সেই কখন টিপয়টার উপর গরম দুধ ও বৈকালিক খাবার রেখে গেছে, এখনও সেইগুলি একই ভাবে পড়ে আছে।

আকাশের কতকগুলি সাদা মেঘ সূর্য্যের আভায় রাঙা হয়ে উঠেছে।

ঃ রেণু?

রেণু চম্‌কে উঠল। পিছনে দাঁড়িয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ।

ঃ তোমার জলখাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এখনও খাওনি কেন?

ঃ ও, কোথায় গেছলে বাবা?

ঃ একটা বিশেষ কাজে হুগলী যেতে হয়েছিল মা!

ব্রজেন্দ্রনাথ সম্মুখের একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে শুধালেনঃ আজও কি তোর আবার জ্বর হয়েছে মা?

ঃ না। হঠাৎ ওকথা জিজ্ঞাসা করছ কেন বাবা?

ঃ তোর মুখটা বড্ড শুক্‌নো শুক্‌নো দেখছি কিনা।

ঃ জান বাবা! কাল রাত্রি থেকে অর্জ্জুনদাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ব্রজেন্দ্রনাথ মেয়ের কথায় যেন সহসা একটু চম্‌কে উঠলেন, পরক্ষণেই সে ভাবটা গোপন করে মৃদু হেসে বললেনঃ কেন? কোথায় গেছে সে?

ঃ তা'ত জানি না বাবা!

ঃ কেন? সে বলে যায়নি? তারপর একটু থেমে বললেন,—কোথায় আর যাবে? আসবে'খন। তুই খাবার খেয়ে নে মা। আমি স্নান সেরে এখুনি আসছি।

ব্রজেন্দ্রনাথ স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

সত্যই ব্রজেন্দ্রনাথের মনে অর্জ্জুনকে সেই চোরা-ঘরের মধ্যে বেশিদিন আটকিয়ে রাখার ইচ্ছা ছিল না, শুধু তাকে একটু শিক্ষা দেওয়া—এইটুকু মাত্র অভিপ্রায়।

ব্রজেন্দ্রনাথ মনে মনে হাসছিলেন আর ভাবছিলেন, এতক্ষণে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, এইবার গিয়ে খুলে দিতে হবে।

ব্রজেন্দ্রনাথ স্নান সেরে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হতে লাগলেন।

সাঁঝের আঁধারটা তখন গুটি গুটি পা ফেলে ক্লান্ত ধরণীর উপর নেমে আসছে। কর্ম্মমুখর সহরের দীপালোকমালা একে একে জ্বলে উঠেছে। ব্রজেন্দ্রনাথ গায়ে একটা নাইট গাউন চাপিয়ে বারান্দায় এসে দেখলেন, রেণু তখনও একইভাবে সেই চেয়ারটার উপর এলিয়ে

পড়ে আছে। তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে কন্যার মাথায় হাত রাখলেন ঃ এখনও এখানে এই ঠাণ্ডায় পড়ে কেন মা ? ঘরে যাও।

রেণু চেয়ার হতে উঠে বলল ঃ হাঁ যাই। তুমি কি এখন আবার বেরুবে বাবা ?

ঃ হাঁ মা, একটা জরুরী কাজ আছে !

গ্যারেজ থেকে গাড়ী বের করবার জন্য সোফারকে উপরের বারান্দা হতে আদেশ দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ড্রয়ার হতে গুদামের চাবীটা নিয়ে নীচে নেমে এসে দেখলেন, সোফার গাড়ী-বারান্দার সামনে গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ সোফারকে বললেন ঃ আমি নিজেই গাড়ী ড্রাইভ করব। তোমার আর যেতে হবে না। সোফার সেলাম দিয়ে গাড়ী হতে নেমে এল। ব্রজেন্দ্রনাথ গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলেন।

ষ্টিয়ারিংএ হাত রেখে ব্রজেন্দ্রনাথ ভাবছিলেন, ওখান হতে অর্জ্জুনকে নিয়ে তিনি বরাবর বাড়ীতে ফিরবেন। রেণু নিশ্চয়ই তা'র বাবার সঙ্গে অর্জ্জুনদাকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। বেশ মজা হবে। আজকে আর ওকে কোথাও যেতে দেওয়া হবে না, এখানেই খাবে, শুয়ে থাকবে,—শরীরের উপর দিয়ে কম ধকলট যায়নি তো ! কিন্তু বাহাদুর ছেলে বটে ! এই ধরণের ছেলেদের নাড়াচাড়া করতে আনন্দ পাওয়া যায়।

চতুর্দ্দিকের জমাট অন্ধকার যেন তাকে নির্ম্মমভাবে ঠেসে ধরতে চায়। বায়ুলেশহীন রুদ্ধদ্বার গৃহ—দম আটকে আসে। হাঁপ ধরে।

ধীরে ধীরে অর্জ্জুনলাল আপনার মধ্যে আপনি আবার ফিরে এল।

টর্চ্চের বোতামটা টিপতেই একটা তীব্র আলোর রশ্মি কালো আঁধারের বুক চিরে ছড়িয়ে পড়লো। সে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলে ঘরের চারিদিক দেখতে লাগল।

ঘরের মেঝেটা ঢালু হয়ে নীচে নেমে গেছে। ঘরের চারপাশের করোগেটের দেওয়াল খাড়া উঠে গেছে। কোথাও নির্গমের এতটুকু একটা ছিদ্রপথ নেই।

পা টিপে টিপে অর্জ্জুনলাল নীচের ঢালু মেঝেতে নামতে লাগল। ঘরের মধ্যে কতদিনকার অবরুদ্ধ বায়ু যে চাপ বেঁধে সঞ্চিত হয়ে আছে কে জানে? নির্ম্মম আঁধার চারপাশ হতে যেন বাদুড়ের মত ঝুলছে।...

দেওয়ালের গায়ে মরচে ধরেছে, পায়ের তলার সিমেণ্টটা স্থানে স্থানে চটে গেছে...কিন্তু কী ঠাণ্ডা! হিমানীর মতই শীতল...পায়ের তলা শির্ শির্ করে। হাত দিয়ে অর্জ্জুনলাল দেওয়ালের গায়ে চাপ দিতে লাগল। উঃ কী শক্ত! লোহার পাতের মতই মজবুত।

হঠাৎ অন্ধকারে কি যেন নরম একটা বস্তু পিছলে গেল। এক লাফে অর্জ্জুন পিছনের দিকে সরে গেল।

আলো ফেলতেই দেখা গেল খুব বড় একটা ইন্দুর অন্ধকারে ছুটে গেল। আশ্চর্য্য! এই ছিদ্রলেশহীন গুদাম ঘরে ইন্দুর এলো কোথা হতে? ওই সামনের দিক দিয়েই যেন কোথায় পালাল। নিশ্চয়ই তবে এ ঘরের কোথাও না কোথাও যত ছোটই হোক একটা ছিদ্র-পথ অন্ততঃ আছেই।

কিন্তু কোথায় ?

অর্জ্জুনলাল আলো ফেলে ফেলে ছিদ্রান্বেষণে ব্যাকুল হয়ে উঠল। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ টের পেল, পায়ের তলায় বেশ ভিজা ভিজা লাগছে। অর্জ্জুনলাল মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ল। একটা চৌকা লোহার পাত চার পাশে বল্টু দিয়ে আঁটা—তারই গায়ে ছোট ছোট ছিদ্রপথ। একটা কল কল শব্দ শোনা গেল। কাছাকাছি কি কোথাও জল আছে নাকি ?···অর্জ্জুনলাল খুব ভাল ক'রে কান পেতে শুনবার চেষ্টা করতে লাগল। নিশ্চয়ই···কোন ভুল নেই··· এই ভূগর্ভস্থ গৃহের আশে পাশে নিশ্চয়ই কোন গতিশীল জলধারা আছে। এ তারই শব্দ।···

অর্জ্জুনলাল হাত দিয়ে সেই লোহার পাতের উপর জোরে চাপ দিতে লাগল। হাতের চাপে, হাতের তেলোয়···লৌহচূর্ণ লেগে গেল, কিন্তু লোহার পাত ভীষণ শক্ত ও মজবুত।

কাৎ হয়ে শরীরের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করে অর্জ্জুনলাল লোহার পাতটায় ক্রমেই চাপ দিতে লাগলো। মচ্ মচ্ ক'রে একটা ক্ষীণ শব্দ হলো। আলো ফেলে দেখা গেলো, এক চাপেই পাত্‌টা বাইরের দিকে অনেকটা তুমড়ে বসে গেছে। মুক্তির একটা ক্ষীণ আশা মনের কোণে উঁকি মেরে গেলো। আবার সে প্রবলভাবে চাপ দিতে লাগলো···

পরিশ্রমে, উত্তেজনায় সর্ব্বশরীর দিয়ে ঝর ঝর করে ঘাম ঝরে পড়ছে—সেদিকে তা'র লক্ষ্য নাই, অবিরাম প্রাণপণে লোহার পাতটাকে খুলবার প্রয়াস চলছে। গোটা দুই ছিদ্রের পাশ

দিয়ে খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝির্ ঝির্ ক'রে একটা শীতল বায়ুপ্রবাহ ছুটে এল।···আঃ প্রাণটা জুড়িয়ে গেল! বদ্ধঘরের বদ্ধ পারিপার্শ্বিকে এ যেন একটুক্‌রো আলোর হঠাৎ ঝলকানি!···

দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে পরিশ্রান্ত অর্জ্জুনলাল হাঁফাতে লাগল।

হঠাৎ জলের মতই ঠাণ্ডা কী যেন গায়ের উপর ছল্‌কে এসে পড়্‌লো।

—এ যে জল?···তাইত···জল? জল এল কোথা হতে?··· ভক্ করে খানিকটা জল সেই ভাঙ্গা পথ দিয়ে ভিতরে এসে পড়্‌ল।··· ভাঙ্গা অংশের দুই দিক দুই মুষ্টিতে আঁকড়ে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে সে আকর্ষণ করলো। এক টান, আরো এক টান! এখন অনায়াসে হাত গলান যায়। ভক্ ভক্ করে ঠাণ্ডা জলস্রোত ঘরের ভিতর ছুটে আসতে লাগল। এবার মরিয়া হয়ে উঠল অর্জ্জুনলাল।

ডান পা দিয়ে চাপ দিয়ে, হাত দিয়ে ভাঙ্গা একটা অংশ এবার আরো জোরে টানতে লাগল।

পায়ের তলার মেঝেয় বেশ জল জমে উঠেছে···ছপ্ ছপ্ করছে। জলস্রোতের গতি ক্রমেই বাড়্‌তে লাগল।

তাইত এখন উপায়! ভীষণ বেগে জলের স্রোত কল কল ক'রে ছুটে আসছে।

অর্জ্জুনলাল জল আগমের পথটা দুই হাত দিয়ে চেপে বাঁধা দিতে গেল, কিন্তু বৃথা। দুই হাতের পাতা দিয়ে ত' সমস্ত পথটা চাপা দেওয়া যায় না···আশেপাশের অনেকটা পথই উন্মুক্ত হয়ে গেছে···

উন্মুক্ত আবেগে জলরাশি ছুটে আসতে লাগল পৃঃ ৬৩

তীব্র গতিতে জল সেই পথ দিয়ে হু হু শব্দে ছুটে আসছে। অর্জ্জুনলাল পাগল হয়ে উঠল।

জল হাঁটু পর্য্যন্ত এসে ঠেকল।

কাৎ হয়ে পিঠ পেতে জলের গতি পথ রোধ করবার চেষ্টা করতে লাগল ; কিন্তু সকলই পণ্ডশ্রম!…উন্মত্ত আবেগে জলরাশি কলকল ছলছল শব্দে মৃত্যুর মতই মুখ ব্যাদান করে ছুটে আসতে লাগল।

জল বাড়ছে।…

একটু একটু ক'রে হাঁটু পেরিয়ে কোমর।…কোমর ছেড়ে বুক।… তারপর গলা।…আর ত দাঁড়ান যায় না…এবারে মাটি ছেড়ে অর্জ্জুনলাল সাঁতরাতে আরম্ভ করল।

ঘরের মধ্যে সঞ্চিত এত দিনকার আবর্জ্জনারাশি জলের স্রোতে চারিদিকে ভেসে উঠল। অর্জ্জুনলালের পরিশ্রান্ত দেহভার আর বুঝি বয় না।…এইবার বুঝি তলিয়ে যাবে।—আর রক্ষা নাই। মৃত্যুর আর দেরী নাই। হায় রে, কে জানত এমনি ক'রেই তা'র জীবনের শেষের দিনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন এক নির্জ্জন ঘরের মধ্যে ঘনিয়ে আসবে! আজও যে তা'র বুক-ভরা অনন্ত আশা।

তা'র সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার এমনি ক'রেই বিঘোরে পরিসমাপ্তি হবে?…

দৈহিক মরণ-যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে অন্তরের বিক্ষুব্ধ বাসনা তাকে পাগল ক'রে তুলল।

# চৌদ্দ

গাড়ী যখন বরাহনগরের সেই পুরাতন গুদাম ঘরটার কাছে এসে দাঁড়াল, ব্রজেন্দ্রনাথ হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন, রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে আটটা।

গাড়ীটাকে গেটের একপাশে দাঁড় করিয়ে রেখে ব্রজেন্দ্রনাথ ভিতরে ঢুকলেন। আলো ফেলে জঙ্গলাকীর্ণ উঠানটা পার হয়ে ঘরের দরজাটার কাছে এসে দাঁড়ালেন। চাবী দিয়ে তালাটা খুলে দরজার কবাটটা ঠেলে খুলে ফেললেন। টর্চের আলো ঘরের মধ্যে ফেলতেই তিনি উঠলেন চম্‌কে; ঘরের মেজেতে জল থৈ থৈ করছে।

একি এখানে জল এল কোথা হতে? আশ্চর্য্য!

অর্জ্জুন! অর্জ্জুন গেল কোথায়?

ব্রজেন্দ্রনাথ উদ্বিগ্নভাবে ঘরের চারদিকে হাতের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন! কিন্তু শুধু জল আর জল। কোন মানুষের চিহ্ন পর্য্যন্ত সেখানে নেই। শুধু জলের উপর এখানে সেখানে নানা আবর্জ্জনা ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ব্যস্ত ভাবে ব্রজেন্দ্রনাথ মেঝেতে এসে জলের ভিতর নামলেন।

জল প্রায় তাঁ'র হাঁটু অবধি।

চারিদিক তন্ন তন্ন ক'রে আলো ফেলে ফেলে খুঁজলেন, কিন্তু বৃথা! অর্জ্জুনলাল সেখানে নেই। কোথায় তবে গেল সে?

ব্রজেন্দ্রনাথ চিন্তিত মনে গুদাম ঘর হতে গাড়ীতে উঠে বসলেন।

একটা কথা তাঁ'র মনে পড়ল সহসা। তবে কি সেই ঘরের

কোন রাস্তা দিয়ে অর্জ্জুনলাল গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে; অসম্ভব নয়। গঙ্গার জলের ভিতরেই ঐ ঘর। হয়ত বেচারী পালাবার চেষ্টায় কোন রাস্তা করতে গেছল, ফলে সেই রাস্তা দিয়ে জল ঢুকে পড়েছে। হয়ত বা তখন গঙ্গায় জোয়ার ছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ আবার গাড়ী হতে নেমে পড়লেন, বাড়ীটার পিছন দিক দিয়ে ঘুরে গঙ্গার কিনারে গিয়ে হাজির হলেন।

গঙ্গায় তখন জোয়ারের শেষে ভাটার টান ধরেছে। জল অনেকটা নেমে এসেছে। তবে এমন বিশেষ কিছুই নয়। ঘোলাটে জলরাশি তখনও সেই ঘরের দেওয়ালে ছলছলাৎ ক'রে আছড়ে পড়ছে। রাত্রির আঁধারে কলকল ছলছল শব্দ শুধু কানে এসে বাজে; নিরাশ চিত্তে ফিরে এসে গাড়ীতে উঠে ষ্টার্ট দিলেন।

রেণুর কাছে অর্জ্জুনলালদের কর্ম্মায়তনের কথা ব্রজেন্দ্রনাথ অনেকবার শুনেছেন, গাড়ী সেই দিকেই চালালেন। ঠিকানা খুঁজে নিতে বেশী বেগ পেতে হলো না। সেখানকারই একজন লোক তা'কে রাস্তা দেখিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেল।

লাইব্রেরী ঘরে প্রফুল্ল বসে একটা খাতায় কী—সব লিখছিল, ব্রজেন্দ্রনাথ সেই ঘরে এসে ঢুকলেন।

পায়ের শব্দে মুখ তুলে ব্রজেন্দ্রনাথকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্ময়ে ও ভয়ে প্রফুল্লর সমস্ত মুখটা গম্ভীর ও কঠিন হয়ে উঠ্‌ল।

ঃ অনির্ব্বাণ বাবু আছেন?—ব্রজেন্দ্রনাথ শুধালেন।

প্রফুল্ল এবার আরো বিস্মিত হল, তবু চোক তুলে জিজ্ঞাসা করল ঃ কেন? তাঁর কাছে আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি?

ঃ হ্যাঁ বিশেষ ! কোথায় তিনি, এইখানে আছেন কি !

ঃ আছেন !

ঃ আমি তাঁর সঙ্গে একটিবার দেখা করতে চাই।

ঃ আসুন আমার সঙ্গে।

ব্রজেন্দ্রনাথ প্রফুল্লকে অনুসরণ করে এগিয়ে চললেন।

কর্ম্মায়তনের ঘরে ঘরে ছেলেদের দল নানা কাজে ব্যস্ত। কোথাও তাঁত বুনার ঠকাঠক মাকুর শব্দ। কোথাও বেতের চুবড়ী ইত্যাদি বোনা চলছে। কোথাও ছেলের দল বসে লেখাপড়া করছে। ব্রজেন্দ্রনাথ চারদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে চললেন প্রফুল্লর পিছু পিছু।

অন্ধকার গঙ্গার ঘাটে বাঁধান সিঁড়ির উপরে চুপটি করে একাকী বসে কাকামণি গুনগুন করে গান গাইতেছিলেন। পায়ের শব্দে পিছনে না তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করলেনঃ কে ? প্রফুল্ল ? কি দরকার বাবা ?

ঃ ব্রজেনবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ এগিয়ে এসে কাকামণির সামনে দাঁড়ালেন। কাকামণি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন।

ঃ চলুন ঘরে গিয়ে বসা যাক্।

ঃ না না ! আর ঘরে যাবার দরকার কী। এখানেই বেশ বসা যাবে'খন !

বলতে বলতে ব্রজেন্দ্রনাথ কাকামণির একপাশে সিঁড়ির উপর বসে পড়লেন।

প্রফুল্ল ত' অবাক। কিন্তু সে আর সেখানে অপেক্ষা না ক'রে ফিরে গেল ব্রজেন্দ্রনাথের কথাই ভাবতে ভাবতে। ব্যাপার কী? ব্রজেন্দ্রনাথ তাদের কর্ম্মায়তনে! এ যে কেবল অভাবনীয় নয়, একেবারে আশ্চর্য্য!

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন।

শুধু অন্ধকারের জমাট নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল গঙ্গার অবিশ্রাম কুলু কুলু শব্দ। মাঝে মাঝে গঙ্গাবক্ষ হতে ঠাণ্ডা হাওয়া শির্‌শির্ ক'রে বয়ে যাচ্ছিল। কাকামণিই প্রথমে নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলেন। ঃ ব্রজেন্দ্রবাবু, আমার কাছে কি আপনার কোন প্রয়োজন ছিল?

ব্রজেন্দ্রনাথ ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারছিলেন না কেমন ক'রে কোন্‌খান হতে কথাটা কাকামণির কাছে তুলবেন, কিন্তু কাকামণি নিজেই তাকে এ বিপদ হতে উদ্ধার করলেন ঃ আমি জানি ব্রজেন্‌বাবু, আপনি কেন আমার কাছে এসেছেন। কিন্তু আমি বলি এর বিশেষ এমন কিছুই প্রয়োজন ছিল না, সে রকম কোন দরকার বুঝলে এতক্ষণে কখন গিয়ে আমি আপনার কাছে হাজির হতাম!

ঃ আপনি?

ঃ হ্যাঁ! মানে আমি অর্জ্জুনলালের কথাই বলছি, আমি যে তাকে নিয়ে আজ দীর্ঘ সাত আট বছর ধ'রে নাড়াচাড়া করছি। এরা সবাই একটু ব্যস্তই হয়ে উঠেছিল; কিন্তু আমি ওদের বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, অর্জ্জুনলালের জন্য ভয়ের বা চিন্তার কোন কারণ নেই। সে ফিরে আসবেই, আজ না হলে কাল, আর কাল না হলে নিশ্চয়ই পরশু সে আসবেই।

ঃ কিন্তু এর মধ্যে একটু চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মিঃ চৌধুরী।

ঃ চিন্তার কারণ!—কাকামণি উৎসুক দৃষ্টিতে ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে তাকালেন।

ঃ অর্জ্জুনলালকে আমিই একটা ঘরে আট্‌কে রেখেছিলাম।

তারপর একে একে সমগ্র ব্যাপারটি খুলে ব'লে শেষটায় তিনি বললেন ঃ কিন্তু আমিই যে এখন চিন্তিত হয়ে উঠেছি মিঃ চৌধুরী! তাই ত' পরামর্শের জন্য আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

ঃ সেই ঘর হতে বের হবার আর কোন পথই ছিল না?

ঃ না।

ঃ তবে সে নিশ্চয়ই গায়ের জোরে বের হবার পথ তৈরী ক'রে নিয়েছে; এবং শেষে সেই পথেই ঘরে জল ঢুকেছে।

ঃ কিন্তু তা হলে সে কোথায় গেল? এতক্ষণে ত' তা'র এখানেই আসা উচিত ছিল।

ঃ হয়ত পথে কোন কাজে আট্‌কা পড়েছে।

এমন সময় অদূরে অন্ধকারে নিঃশব্দে একটা নৌকা এসে ঘাটে ভিড়ল। কে একজন লোক নৌকা হতে নেমে কাকামণির সামনে এসে দাঁড়াল।

লোকটার মুখের দিকে চেয়ে কাকামণি শুধালেন ঃ কী খবর পরাণ?

ঃ সুরজিৎ সিংএর অবস্থা খুবই খারাপ। দিদি আমায় পাঠিয়ে দিলেন, এখুনি আপনাকে একবার নিয়ে যেতে।

কাকামণি হাসলেন ঃ সময় যদি তা'র শেষই হয়ে এসে থাকে তবে আমি গিয়ে আর কি এমন বেশী করবো পরাণ। তবে অমিয়া যখন ডেকেছে তখন একবার কেন, একশ'বার যেতে হবে। আচ্ছা, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি চাদরটা নিয়ে আসি। আসুন ব্রজেন্দ্রবাবু, আপনাকে গেট পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি চলুন।··· দেখলেন ত' পরওয়ানা এসে হাজির, এখুনি আমায় বের হতে হবে।

কর্ম্মায়তনের লাল সুড়কী-ঢালা পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কাকামণি বললেন ঃ আপনার মত লোকের পায়ের ধুলো আমাদের এই আশ্রমে পড়বে এতো ভাবতেই পারিনি! যে জন্যই হোক আপনাকে যে এখানে একটি দিনের জন্যও আসতে হয়েছে, তাতে আমি যে কি খুসীই হয়েছি তা আর কী বলব!—কাকামণি ব্রজেন্দ্রনাথকে তা'র গাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে গেলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ যখন বাড়ীতে ফিরে এলেন, রাত্রি তখন প্রায় এগারটা। বারান্দা দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ তা'র নজরে পড়ল, রেণুর ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলেন, টেবিলের উপর হাতের 'পর মাথা রেখে রেণু বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। সামনেই একটা বই খোলা পড়ে আছে!

নিঃশব্দে এগিয়ে এসে ব্রজেন্দ্রনাথ সস্নেহে কন্যার আনত মস্তকে একখানি হাত রাখলেন।

ঃ রেণু!—রাত অনেক হয়েছে, এবার ঘুমাতে যাও মা!

ঠিক সামনেই মাথার উপরে রেণুর মার একখানি প্রকাণ্ড তৈলচিত্র ঝুলছে। সেই দিকে নজর পড়তেই ব্রজেন্দ্রনাথ যেন সহসা

মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তৈলচিত্রের গায়ে প্রকাণ্ড একটি ফুলের মালা। এই মালা প্রত্যহ রেণু নিজের হাতে বদলিয়ে দেয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ নিঃশব্দে মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন।

সহসা একসময় ব্রজেন্দ্রনাথ মেয়েকে প্রশ্ন করলেন : অর্জ্জুনদাকে তোর খুব ভাল লাগে, না মা ?

: হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করছো কেন বাবা ?

: এমনি !

: হাঁ বাবা ! সত্যি অর্জ্জুনদাকে আমি খুব ভালবাসি। আর অর্জ্জুনদাও আমাকে যে কী ভালই বাসেন !...

---

## পনের

এদিকে অর্জ্জুনলাল সাঁত্‌রাতে সাঁত্‌রাতে ক্রমেই এলিয়ে পড়ছিল। সে যথাসম্ভব হাত দিয়ে সেই ঘরের দেওয়ালেব চার পাশ ঠেলতে লাগল।

হঠাৎ তা'র হাতে একটা নরম টিনের কিংবা ক্ষয়ে যাওয়া ষ্টিলের বেড়ার মত কী একটা যেন ঠেক্‌ল! সে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে সেইখানে দুই হাত দিয়ে জোরে ঠেলা দিল।

ঠেলা দিতেই হাতটা সেই বেড়ার ফাঁকের মাঝে ঢুকে গেল। সে তখন প্রাণপণ শক্তিতে বেড়াটাকে নিয়ে টানাটানি করতে লাগল। টানাটানির চোটে ফাঁকটা আরো বড় হয়ে গেল, তখন অনায়াসেই জলের মধ্যে ডুব দিয়ে অর্জ্জুনলাল সেই ফাঁকের মধ্য দিয়ে দেহটাকে গলিয়ে দিল। সেই ফাঁক দিয়ে দেহটাকে গলাবার সময় দেহের অনেক জায়গা কেটে গেল, কিন্তু সেদিকে মন দেবার মত অবস্থা অর্জ্জুনের আর ছিল না।

অনেকক্ষণ পরে সে জলেব ভিতব হতে মাথা তুলল। একটা মুক্ত হাওয়ার পরশ তা'র চোখে মুখে এসে ঝাঁপটা দিল। কয়েকটা ছোট্‌ বড় ঢেউ তার মুখের উপর এসে ছল ছলাৎ ক'রে আঘাত দিয়ে গেল।

—আঃ! হাওয়া! মুক্ত হাওয়ায় গোটা দুই বড় বড় নিঃশ্বাস টেনে অর্জ্জুনলাল একটু আরাম পেল, কিন্তু সমগ্র শরীরের গ্রন্থিতে

গ্রন্থিতে তখন গভীর অবসন্নতা, মাথাটা যেন লোহার মত ভারী; জলের উপরে কিছুতেই আর ঠিক রাখা যায় না। হাত পা দেহ সব যেন দশ মণ ভারী হয়ে উঠেছে; জলের তলায় তলিয়ে যেতে চায়।

উপরে রাত্রির কালো আকাশ তারার ওড়না গায়ে চাপিয়ে নিদ্রালু দৃষ্টিতে নীচে গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে। ওই দূরে এক সার আলো মিটি মিটি জ্বলছে। একটা ছোট্ট ষ্টীমার সিটি দিতে দিতে জলের বুকে আলোড়ন জাগিয়ে ছুটে গেল! নাঃ! আর কতক্ষণ অর্জ্জুন জলের উপর এই ভাবে ভাসবে!

এমন সময় দূর হতে একটা ক্ষীণ গানের সুর ওর কানে ভেসে এল। কোন নৌকার মাঝি বুঝি আপন মনে গাইতে গাইতে এদিকেই নৌকা বেয়ে আসছে।

অর্জ্জুন প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করবার চেষ্টা করল। কিন্তু তা'র অবসন্ন কণ্ঠ চিরে একটা ক্ষীণ আওয়াজও বেরুল না। হাঁ ক'রে ডাকতে যাওয়ার দরুণ খানিকটা গঙ্গার ঘোলাটে জল গলার মধ্যে ঢুকে গেল।

আবার অর্জ্জুন চীৎকার করতে চেষ্টা করলে। এবারে একটা ক্ষীণ আওয়াজ বেরুল বটে, কিন্তু খুব স্পষ্ট নয়। নৌকাটা ততক্ষণ হাত ছয়েকের মধ্যে এসেছে।

নৌকার ছৈয়ের গায়ে টাঙ্গান হারিকেনের অনুজ্জ্বল আলোর ক্ষীণ একটা রশ্মি গঙ্গার ঘোলাটে জলে প্রতিফলিত হয়ে থির্‌থির্‌ ক'রে কাঁপছিল।

অর্জ্জুন তা'র অবসন্ন ডান হাতটা কোন ক্রমে তুলে জলের ওপর শব্দ করতে লাগল। অর্জ্জুনের দেহটা তখন ক্রমে জলে তলিয়ে যাচ্ছে। সে একবার শেষ শক্তি নিয়ে বৃথাই চীৎকার ক'রে নিজের উপস্থিতিটা জানাবার চেষ্টা করলে।

তারপর একসময় ওর মনে হলো, কে যেন ওর দেহটা উপরের দিকে টানছে। তারপর আর মনে নেই।

অর্জ্জুনের জ্ঞান যখন ফিরে এল, সে চেয়ে দেখলে, নৌকার পাটাতনের উপর সে শুয়ে। মাথার উপরে রাত্রির নক্ষত্রখচিত নিঝুম আকাশ। কানে এসে বাজছে জলের একটানা কল্‌কল্‌ ছল্‌ছল্‌ শব্দ। একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস টেনে গভীর অবসাদে অর্জ্জুন পাশ ফিরে শুতে গেল। কিন্তু সমগ্র শরীর জুড়ে অসহ্য ব্যথা মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ ক'রে উঠ্‌ল।

দারুণ পিপাসায় কণ্ঠতালু তখন শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে, ক্লান্তস্বরে সে শুধু কোন মতে বললে: একটু জল!

ব্রজেন্দ্রনাথকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে কাকামণি নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

কাকামণির ঘরের বারান্দায় অন্ধকারে একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে অমিতা চুপটি ক'রে দাঁড়িয়েছিল। কাকামণি নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকে ব্রাকেট্‌ হতে খদ্দরের চাদরটা কাঁধের উপর ফেলে কুলঙ্গীতে রক্ষিত একটা কাঠের বাক্স হতে কয়েকটা টাকা জামার পকেটে নিলেন।

অমিতা তখনও একই ভাবে সেই খুঁটিটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাকামণি পিছন হতে এসে মৃদুকণ্ঠে বললেন : আমি একটু বেরুচ্ছি মা অমি, তুমি প্রফুল্লকে নিয়ে গ্রে ষ্ট্রীটে ফিরে যেও। ফিরতে আমার বোধ হয় একটু দেরীই হবে।

: এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছেন ?

: পরাণ পরওয়ানা এনেছে মা ! অমিয়া ডেকে পাঠিয়েছে।

: কোথায় ?

: দক্ষিণেশ্বরে। আচ্ছা মা, আমি চললাম।—কাকামণি বারান্দা হতে নেমে ঘাটের পথে এগিয়ে চললেন।

কাকামণি অর্জ্জুনলালের কথাই ভাবছিলেন। বাইরে তিনি যতই বলুন না কেন, এ দুটো দিন চোখের সামনে তা'র প্রিয় শিষ্যকে না দেখে তা'র মনটা সত্যিই একটু বিচলিত হয়েছিল। কিন্তু ব্রজেন্দ্র-নাথের কথায় একদিক হতে যেমন তিনি ভরসা পেয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি একটা সত্যিকারের চিন্তার কারণই এক্ষণে 'তার মনটাকে দোলা দিচ্ছিল ; এমন সময় পশ্চাতে পায়ের মৃদু শব্দ শুনে তিনি পিছন দিকে ফিরে তাকিয়ে অমিতাকে দেখে বিস্মিতকণ্ঠে শুধালেন : একি ! অমু নাকি ?

: হাঁ, কাকামণি আমি। আপনার মুখে অমিয়াদির কথা শুনে অবধিই আমার ইচ্ছা যে তা'কে একটিবার দেখে আসব। ভেবেছিলাম অর্জ্জুন এলে দু'জনে যাবো ; কিন্তু আপনি নিজেই যখন যাচ্ছেন্, তখন আপনার সঙ্গেই যাবো ঠিক করলাম।

: বেশ, তবে চল।

দু'জনে এসে নৌকার উপর উঠে বসলেন। পরাণ লগি ঠেলে নৌকাটাকে গভীর জলে ভাসিয়ে দিল। ভাটার গঙ্গা তর্‌তর্‌ ক'রে বয়ে চলেছে। মাথার উপর রাত্রির কালো আকাশ নক্ষত্রখচিত।

দু'জন দাঁড়ী দাঁড় টানছিল; পরাণ হাল ধরেছিল। কাকামণি পরাণের দিকে চেয়ে বললেন: উত্তুরে হাওয়া আছে বোধ হচ্ছে, পালটা খাটিয়ে দাও না পরাণ!

: তাই দেবো বাবু, আর একটু উজান ঠেলে নিই আগে।

: রাত কটা হবে ব'লে ঠাওর হয় পরাণ?

: কত আর। এই গোটা এগারই বোধ করি, হবে।

: আমাদের পৌঁছতে কতক্ষণ লাগ্‌বে?

: তা বারোটা সওয়া বারোটা নাগাদ পৌঁছে যাবো। উজান ঠেলে যেতে হচ্ছে কিনা!

একটু পরেই নৌকায় পাল খাটিয়ে দেওয়া হল। হাওয়া লেগে পাল ফেঁপে উঠ্‌ল, আর সঙ্গে সঙ্গে নৌকার গতিও গেল বেড়ে।

ওপাশ হতে আর একটা মহাজনী নৌকা এদিকেই আসছিল। নৌকাটা একটু কাছাকাছি হতেই সেই মহাজনী নৌকার একজন মাঝি চীৎকার ক'রে পরাণদের নৌকাটা একটু থামাতে বললে।

: কেন? পরাণ শুধাল।

: মুস্কিল বেধেছে। একটি বাবু জলে ডুবে যাচ্ছিল, তেনারে তুলে আনলাম; তা আমাদের ত' মাল নিয়ে পৌঁছুতে হবে; তোমরা যদি বাবুটিরে একটু পৌঁছে দাও; বাবুটি এখনও বড় ক্লান্ত।

কাকামণিই বললেন: দেখ দেখ পরাণ, ব্যাপারটা কী!

তখন পরাণ নৌকাটাকে বড় নৌকাটার ধারে নিয়ে লাগাল।

হঠাৎ পরাণের আনন্দ-মিশ্রিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল : আলোটা একটু ভাল ক'রে ধর দেখি ; এ যে অর্জ্জুন দাদা ব'লে বোধ হয়!

কাকামণির কানেও কথাটা গেল, তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। : কী হল পরাণ!

: বাবু! অর্জ্জুন দাদা এই নৌকোয়!

: এ্যাঁ! দাঁড়াও দাঁড়াও!

সত্যি অর্জ্জুনলালই! কাকামণি এগিয়ে গিয়ে বিপুল স্নেহে দুই হাত বাড়িয়ে অর্জ্জুনকে বুকের উপর তুলে নিলেন। চোখের কোল দুটো তা'র ততক্ষণে জলে ভরে উঠেছে।

মহাজনী নৌকার মাঝিরা ত' বেশ একটু আশ্চর্য্যই হয়ে গেছল। তা'রা যখন শুনল বাবুটি এদের একান্তই পরিচিত, তখন তা'রা পরম নিশ্চিন্তে আরামের নিঃশ্বাস ফেল্‌ল। কিন্তু কাকামণি তাদের পাঁচটা টাকা জলপানী খেতে দিলেন। মাঝিরা বললে : না—না! সে কি কথা বাবু! একজন ভদ্রলোক ডুবে যাচ্ছিলেন, আমরা উদ্ধার করেছি, মানুষ হয়ে মানুষকে না বাঁচালে আর কে বাঁচাবে বাবু!

কাকামণি বললেন : না ভাই, তোমরা আমায় যে বস্তু দিয়েছ লক্ষ কোটী টাকাতেও তা'র মূল্য ধার্য্য হয় না। ওটা আমি খুসী হয়ে তোমাদের দুটো টাকা পান খেতে দিয়েছি ; যাঁর চোখে কিছুই এড়ায় না, তিনিই তোমাদের এ কাজের যোগ্য পুরস্কার দেবেন। বলতে বলতে কাকামণির স্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

---

# ষোল

অর্জ্জুনের দেহ তখনও খুব ক্লান্ত।

অমিতার কোলে মাথা রেখে অর্জ্জুন চুপটি ক'রে শুয়েছিল, কাকামণি মাঝে মাঝে পরম স্নেহে তা'র গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন।

ঃ আত্ম-অহঙ্কার মানুষের মনকে ভয়ানক মোহগ্রস্ত ক'রে ফেলে অর্জ্জুন, তখন সে সামান্য ভালমন্দটাও বিচার ক'রে উঠ্‌তে পারে না।

ঃ আমায় ক্ষমা করুন কাকামণি!

ঃ ক্ষমা ত' তোমাকে আমি না চাইবার ঢের আগেই ক'রে ব'সে আছি অর্জ্জুন! আমি কি বুঝতে পারি না যে তোমার মনের গ্লানি আজ কতখানি তোমায় বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছে! আর ভালমন্দ পাপপুণ্য নিয়েই ত' মানুষের চরিত্র গড়ে উঠে। আমি যেমন চাই না যে তোমাদের মধ্যে কেউ সকল সময় ও সকল অবস্থাতেই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে উঠুক, তেমনি এও চাই না যে কেউ পাষণ্ডতায় দুর্য্যোধনকেও ছাড়িয়ে যাক। আমি চাই যুধিষ্ঠিরের ন্যায়নিষ্ঠা ও দুর্য্যোধনের উদ্দামতা ও উল্লাস! আমি চাই যুধিষ্ঠিরের তিতিক্ষা, দুর্য্যোধনের দুঃসাহসিকতা ও বীরত্ব। ভগবান যেমন তোমার বুকে দুর্জ্জয় সাহস ও বাহুতে অমিত শক্তি দিয়েছেন, তার তুমি অপব্যয় করো না। আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করি অর্জ্জুন, এর পর হতে যেন তোমার শক্তির বিলাসিতার অবসান হয়। সূর্য্যের আলোকের মতই অন্তর তোমার প্রভাময় হয়ে উঠুক।

তারপর অনেকক্ষণ সকলেই একপ্রকার চুপচাপ ক'রে রইলেন। হঠাৎ একসময় উঠ্‌তে চেষ্টা ক'রে অর্জ্জুন বললে ঃ এবার আমায় উঠে বসতে দাও অমিতা, শরীরের ক্লান্তি আর আমার বড় নেই। এখন আমি বেশ সুস্থ বোধ করছি।

কিন্তু অমিতা দু'হাতের চাপ দিয়ে অর্জ্জুনকে বাধা দিয়ে বলল ঃ না—না! তোমায় এখন উঠতে হবে না অর্জ্জুন! আর একটু শুয়ে থাক।

অর্জ্জুন কাকামণির কাছে অভিযোগ জানাল ঃ দেখুন না কাকামণি, সেই কখন শরীরের উপর দিয়ে একটু কষ্ট গেছে বলে এখনও নাকি আমায় শুয়ে থাকতে হবে।

অর্জ্জুনের কথায় কাকামণি হাসলেন ঃ অমু, অর্জ্জুন উঠ্‌তে চাইছে বটে, কিন্তু আমি অমন একটি স্নেহের অনুশাসনকে কিন্তু কোনমতেই উপেক্ষা করতে চাইতাম না।

কাকামণির কথায় অর্জ্জুন হোঃ হোঃ করে হেসে উঠ্‌ল ঃ তোমার কোলে এমন করে মাথা রেখে শুয়ে থাকতে দেখে কাকামণির হিংসা হচ্ছে অমিতা।

এবার তিন জনেই একসঙ্গে হেসে উঠ্‌ল।

বাঁ হাত দিয়ে অমিতার ডান হাতের আঙুলগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে অর্জ্জুন বলল ঃ কী নরম আর অসহায় ফুলের মত অমিতার আঙুলগুলো দেখুন কাকামণি!

—রক্ষে কর অর্জ্জুন, আমাদের দেশের মেয়েদের আঙুলগুলি যদি তোমার ঐ সব বারবেল ও মুগুরভাঁজা আঙুলের মত মোটা

মোটা শক্ত শক্ত হয়ে উঠে তবেই হয়েছে আর কি!…এ দুনিয়ায় সব কিছুরই প্রয়োজন আছে অর্জ্জুন! লোহার কাঠিন্যটুকু যেমন একান্ত প্রয়োজনীয়, ফুলের কমনীয়তাটুকু তেমনিই অপরিহার্য্য।

সহসা অর্জ্জুন 'উঃ' ক'রে অস্ফুট একটা চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল।

ঃ কী হল—কী হল অর্জ্জুন!…

অমিতা খিল্‌খিল্‌ ক'রে হাসতে হাসতে জবাব দিলেঃ কুসুম-কোমল অসহায় আঙুলগুলির একটু পরিচয় দিচ্ছিলাম কাকামণি!

অমিতার কথায় কাকামণিও হেসে উঠ্‌লেন।

ঃ উঃ, কব্জিটা আমার এমনভাবে মুচ্‌ড়ে দিয়েছে অমিতা!

অমিতা হাসতে হাসতে বললেঃ এবার এস কব্জিটায় একটু হাত বুলিয়ে দিই।

অর্জ্জুনলাল কৃত্রিম ক্রোধভরে বললঃ থাক, মুচ্‌ড়ে দিয়ে এখন আর হাত বুলাতে হবে না।

এমন সময় পরাণ ব'লে উঠলঃ তা তোমারই ত' দোষ দিদিমণি, অর্জ্জুনদাদা না হয় একটু বলেছিলই, তাই ব'লে অমন ক'রে জব্দ করতে হয়?

ঃ দেখ, দেখত পরাণ! তুমিই বল!

ইতিমধ্যে নানা হাস্য-পরিহাসের মধ্যে নৌকা এসে পাড়ে ভিড়ল।

ভাটার টানে গঙ্গার জল অনেকটা নেমে আসায় বহুদূর বিস্তৃত নরম কাদার ডাঙ্গা জেগে উঠেছে।

পরাণ নৌকার ভিতর হতে একটা হারিকেন জ্বালিয়ে আগে আগে নামল, পরে কাকামণি, অর্জ্জুনলাল ও অমিতা তা'কে অনুসরণ

করল। ভিজা নরম কাদার উপর পা ফেলে ফেলে সকলে ডাঙ্গার দিকে এগিয়ে চলল।

গ্রামের ভিতর দিয়ে অনেকটা পথ অতিক্রম ক'রে সকলে এসে একটা বহু-পুরাতন জরাজীর্ণ একতলা বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াল। আশে পাশে আরো কতকগুলি একই ধরণের বাড়ী।

ঃ এই বাড়ীই তো পরাণ?—কাকামণি শুধালেন। পরাণ মাথাটা ঈষৎ একটু হেলিয়ে জবাব দিল।

বাড়ীর দরজার তলার দিকটা উইয়ে খেয়ে খেয়ে নিশাচর বহু জীবজন্তুর গতিবিধির রাস্তাটা প্রশস্ত ও সরল ক'রে দিয়েছে। উপরিভাগ গোময়লিপ্ত হয়ে অতি বিশ্রী অদ্ভুত এক রূপ ধারণ করেছে। ঠিক বোধ হয় এই একান্ত জীর্ণ পারিপার্শ্বিকের সাথে একটা সামঞ্জস্য রাখতে গিয়েই দেওয়ালের চূণ-বালি-খসা ইটগুলি তাদের দৈন্যপীড়িত অবয়ব বের ক'রে অত্যন্ত নিষ্ঠুর চাপা হাসি হাসছে।

কাকামণি দরজাটার কড়া ধরে গোটা কয়েক নাড়া দিলেন।

চারিদিককার জমাট নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই বিশ্রী খটাখট শব্দটা যেন ভয়াবহ শুনাল। কিন্তু ভিতর হতে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

কাকামণি কড়াটা ধরে আবার নাড়া দিলেন। মনে হলো ভিতর হতে যেন অতি ক্ষীণ কণ্ঠের সাড়া পাওয়া গেল।

একটু বাদেই দরজাটা খুলে গেল। ঈষৎ উন্মোচিত কপাটের ফাঁকে একটি লণ্ঠন ও ঠিক তারই পাশে অতি সুন্দর ম্লানমুখী এক কিশোরীর মুখ দেখা গেল!

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন এল ঃ কে ?

ঃ পুতুল ! আমি মা···কাকামণি জবাব দিলেন ।

কিশোরীর নাম পুতুল। কিশোরীর হস্তধৃত হারিকেনটি আলোর চাইতে ধূমোদ্গীরণই বেশী করছিল। অস্পষ্ট আলোয় যতটুকু দেখা গেল, পরণে তার একখানি মলিন সেলাই করা সাধারণ সাড়ি। তৈলাভাবে রুক্ষ একমাথা কালো চুল কাঁধে বুকে পিঠে এলিয়ে পড়েছে।

মুখখানি করুণ ও অশ্রুসিক্ত, বোধ করি এইমাত্র চোখের জল মুছে এসেছে।

তথাপি তা'র দারিদ্র্যকেও যেন ছাপিয়ে গেছে তা'র মুখের স্বাভাবিক শ্রী—যা তা'র সমগ্র দরিদ্রতার মাঝেও অপরূপ স্নিগ্ধতা দান করেছে।

ধীর মৃদুকণ্ঠে কিশোরী বলল ঃ আসুন।

পুতুলকে অনুসরণ ক'রে সকলে এসে একটা স্বল্পপরিসর জঙ্গলাকীর্ণ উঠানের মধ্যখানে দাঁড়াল। চতুষ্পার্শ্বের সেই নিবিড় আগাছার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সর্পাকৃতি একটা সরু পায়ে চলা পথ।

পুতুল আলো হাতে আগে আগে চলছিল, আর পিছনে অতি সন্তর্পণে চলছিল প্রথমে কাকামণি, তারপর অমিতা, অর্জ্জুনলাল ও সর্ব্বশেষে পরাণ। সহসা সেই ঘন ঝোপের ভিতরে একটা কম্পন তুলে ফোঁস্ ক'রে একটা জীবন্ত প্রাণী দ্রুত চলে গেল।

অমিতা একটা মৃদু চীৎকার ক'রে উঠল। পুতুল বললেঃ

ভয় নেই ; ওরা ত কিছু বলে না ! ওরা আমাদের চেনা হয়ে গেছে ।

আশ্চর্য্য এই মেয়েটি ! বস্তুত এই মাত্র এই আগাছার বনের মধ্যে চঞ্চলতা জাগিয়ে যে প্রাণীটি চলে গেল, সে আর যাই হোক মানুষের কাছে হয়ত এতটুকুও বাঞ্ছনীয় নয় ; তথাপি ওর কচি মনের সহজ বোধশক্তির কাছে যে এ বিন্দুমাত্রও ভয়ের রেখাপাত করতে পারেনি, এইটাই যেন ওর 'ভয় নেই ; ওরা ত কিছু বলে না' এই কথাটির মধ্য দিয়ে একান্ত সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। কিন্তু তার চাইতেও ঢের বেশী আশ্চর্য্য সে হল, কাকামণির প্রশ্নে পুতুলের জবাব শুনে।

ঃ বাবা কেমন আছেন মা ?

ঃ বাবা ! পুতুল যেন চলতে চলতে সহসা একটু থামল এবং পরক্ষণেই বোধ করি একটা চাপা নিঃশ্বাসের ঝড়ে ওর সমগ্র দেহখানা ফুলে উঠল, ক্ষীণ মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল ঃ আপনি আসার কিছুক্ষণ আগেই বাবার প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

ঃ এ্যাঁ অমরদা নেই !—একটা অস্পষ্ট উদ্বেগপূর্ণ চীৎকার কাকামণির কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এল।

সকলে উঠানটা অতিক্রম ক'রে এখন একটা দালানে উঠ্ল।

একটা টানা লম্বা ভাঙা বারান্দা। সম্মুখেই একটা ভাঙা কবাটহীন দরজার গায়ে অতি পুরাতন জীর্ণ চটের পর্দ্দা ঝুলছে। পর্দ্দা সরিয়ে সকলে এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

অদূরে একটা জলচৌকীর উপর একটি কেরোসিনের বাতি মিট্‌মিট্

ক'রে জ্বলছে। মেঝেয় একখানি মলিন শয্যায় কে একজন শুয়ে, সর্ব্বাঙ্গ তা'র একখানি ভারি মলিন চাদরে আবৃত। শিয়রের কাছটিতে একজন মহিলা চুপ ক'রে বসে আছে। তা'র মাথার চুল খুলে গিয়ে একপাশে ঢলে পড়েছে।

ইতিপূর্ব্বে বহুবার অর্জ্জুনলাল অনেককে মরতে দেখেছে এবং মৃতদেহও দেখেছে, কিন্তু সেই মৃত্যুকে ঘিরে এমনি কঠোর ও উলঙ্গ বিভীষিকা বুঝি আর কোন দিনও তা'র চোখে এমনি ক'রে ধরা দেয়নি। কী দারুণ নিঃসঙ্গতা ও কী করুণ রিক্ততা! যেন সমগ্র ঘরখানি জুড়ে একটা নিষ্ফল কান্নার দুর্দ্দমনীয় আবেগ ঘরের রুদ্ধ বাতাসের সাথে সাথে ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে। এ কী কঠোর মৃত্যু! নেই সেখানে একটি ফোঁটা বেদনার অশ্রুজল, কিংবা নেই একটি হাহাকারের করুণ কাতর শব্দ। সমস্ত কিছু ছাপিয়ে যেন ফুটে বেরুচ্ছে একটি মাত্র অনুভূতি, যার প্রকাশ নেই।···যে দেবতা এমনি ক'রে দুটি অভাগিনী নারীকে পথের মাঝে চিরনিঃসম্বল ক'রে বসিয়ে রেখে গেল, তাঁর বিরুদ্ধেও এতটুকু নালিশ নেই!

ঃ মা!···কাকামণি এসেছেন!···মেয়ের ডাকে অমিয়া যেন চম্‌কে মুখ তুলে চাইলেন। ততক্ষণে কাকামণিও এগিয়ে গেলেন ঃ বৌদি···

ঃ এসেছো ভাই! এস। আর আধ ঘণ্টা আগে এলে বোধ হয় শেষ দেখাটা হত!···অমিয়ার বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

* * *

চিতার আগুন লক লক ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল।

কাকামণি, অর্জ্জুনলাল সকলেই সেদিকে রইল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে।

চিতার লেলিহান শিখার দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে কাকামণি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেনঃ এই অমর ছিল আমার ছোটবেলার বন্ধু, অর্জ্জুন, আজ সে চলে গেল। মাত্র চাল্লশ বৎসর বয়স হয়েছিল তা'র। না খেতে পেয়ে—বুঝলে অর্জ্জুন, না খেতে পেয়ে আজ ও এমনি ক'রে শুকিয়ে মরল।

সকলে অবাক হয়ে নিঃশব্দে শুনতে লাগল।

ঃ বিলাত হতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ ক'রে এসে সে একটা বড় ফার্ম্মে মোটা মাইনায় চাকুরী পায়—কিন্তু একদিন একটা হিন্দু কুলী মেয়ের উপর কারখানার সাহেবকে অত্যাচার করতে উদ্যত দেখে সে প্রতিবাদ জানায়, ফলে হলো দু'জনে হাতাহাতি—এবং সেই হাতা-হাতিটা গড়াল শেষ পর্য্যন্ত তা'র পাঁচ বছর জেলে। জেল হতে যখন ও বেরিয়ে এল—তখন হাত যেমন শূন্য, প্রয়োজন তেমনি প্রবল, আর একটা বুক একেবারে সেই সাথে অকর্ম্মণ্য হয়ে গেছে, অন্যটাতেও ঘুণ ধরেছে—এ ক্ষেত্রে যা হয়। দুটো বছরও গেল না। দুরন্ত যক্ষ্মার কবলে পড়ে তাকে পরপারে পাড়ি দিতে হল।

---

# সতের

আসন্ন সন্ধ্যার অস্পষ্ট আভায় গোধূলির আকাশ স্বপ্নময় হ'য়ে উঠেছে। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর বসবার ঘরের প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার উপর স্তূপীকৃত কাগজ ছড়িয়ে গভীর মনোযোগের সাথে কি যেন সব দেখছিলেন, সহসা এমন সময় পাশেই টেলিফোন্ বেজে উঠ্‌ল—ক্রিং ক্রিং ক্রিং...

ঃ 'হ্যালো'...

ঃ বাঁশবেড়ে মিল ম্যানেজারের অফিস্, আমি স্যার ব্রজেন্দ্রনাথকে চাই।

ঃ হাঁ! কথা বল্‌ছি। কি বলুন।

ঃ ওঃ, আজ রাত্রে একটা স্পেশাল মিটিং আছে; মিলের অন্যান্য সেয়ার-হোলডারদের ও একসিকিউটিভ্ বডিকে খবর দেওয়া হয়েছে; রাত্রি আটটায় মিটিং বসবে। এখানকার কুলি-গ্যাং ক্ষেপে গেছে, কাল থেকে হয়ত মিল বন্ধ থাকবে।

ঃ আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

ব্রজেন্দ্রনাথ একান্ত চিন্তিত মনে ফোন্ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাড়াতাড়ি ক'রে জামা-কাপড় পরে প্রস্তুত হয়ে নিলেন।

রেণু এসে সামনে দাঁড়াল ঃ কোথায় যাচ্ছ বাবা?

ঃ একটা বড় জরুরী কাজে বেরুচ্ছি মা! আজ রাত্রে হয়ত বা না ফেরাই সম্ভব, যদি ফিরতে পারি তাও অনেক রাত্রে; তুমি কিন্তু মা বেশী রাত জেগে থেকো না।

ঃ অনেকদিন কাকামণিদের ওখানে যাই নি বাবা, আমাকে একটু ওদের ওখানে পৌঁছে দিয়ে যাবে ?....

ঃ কিন্তু কার সঙ্গে ফিরবে মা ?

ঃ ফিরতে পারব। লোকের অভাব হবে না।...

ঃ আচ্ছা, তবে চল।

ব্রজেন্দ্রনাথ মেয়েকে সঙ্গে ক'রে মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। রেণুকে কাকামণির ওখানে নামিয়ে দিয়ে বাঁশবেড়ের পথে গাড়ী চালালেন।

যশোর ট্রাঙ্ক রোডের মসৃণ পিচ-ঢালা পথের উপর দিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথের দামী গাড়ী বিদ্যুদ্‌গতিতে ছুটে চলেছে। রাস্তার দু'পাশের বড় বড় গাছগুলো আঁধারে যেন হাত বাড়িয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে কানাকানি করছে। বাতাসের সাথে সাথে গাড়ীর পিছনে শুক্‌নো ঝরা পাতাগুলি উড়ে উড়ে পিছিয়ে পড়ছে।

ব্রজেন্দ্রনাথের গাড়ী বাঁশবেড়েতে এসে যখন পৌঁছাল, রাত্রি তখন আটটার কিছু বাকী।

মিলটা ষ্টেশন হতে কিছুটা তফাতে।

সরু কাঁচা মাটির পথ, দু'পাশে বাঁশঝাড় ও নানা জাতীয় গাছে গাছে ঠেসাঠেসি হয়ে স্থানটিকে একেবারে অন্ধকার ক'রে তুলেছে। দু' একদিন আগে বোধ হয় বৃষ্টি হয়ে গেছে। নরম মাটির উপর দিয়ে ধীরে ধীরে ব্রজেন্দ্রনাথ গাড়ী চালাতে লাগলেন।

মিলের ফটকের কাছে আবছা আঁধারে অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তির মত কতকগুলি লোক দাঁড়িয়েছিল। ব্রজেন্দ্রনাথের অত্যুজ্জ্বল হেড্

লাইটের আলো সামনের দিকে পড়াতেই সেই ছায়ামূর্ত্তিগুলি যেন মুহূর্ত্তে কোথায় মিলিয়ে গেল। ব্রজেন্দ্রনাথের মোটরের ইলেকট্রিক হর্ণ বেজে উঠ্‌তেই লৌহফটক ফাঁক হয়ে রাস্তা ক'রে দিল।

মিলের শব্দ তখন ঝর্‌ঝর্‌, ঝম্‌ঝম্‌, ঝটার-ঝটার ক'রে নৈশ আকাশকে ভরিয়ে তুলছে। ব্রজেন্দ্রনাথ সুতা-কাটার ঘরে এসে ঢুকলেন। অসংখ্য লোকজন যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। মেসিনের ছোট বড় চাকাগুলি ঘড়্‌-ঘড়্‌ শব্দে ঘুরে চলেছে। ব্রজেন্দ্রনাথ চারদিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চললেন। একজন বুড়ো মিস্ত্রি একটা তেলের ক্যান নিয়ে চাকার গর্ত্তে ফোঁটা ফোঁটা তেল ঢালছিল, অদূরে চুল্লীর আগুনের আভায় সমস্ত চোখ-মুখ ও শরীর যেন রক্ত রাঙা হয়ে উঠেছে। কে একজন পায়ে পায়ে তা'র পাশে এসে দাঁড়াল।

ঃ গহর, আজ রাত্রি বারোটায় মিটিং, তোমার ত' দশটার পর অফ ( ছুটী ), মিটিংয়ে যেতে ভুলো না কিন্তু। যন্ত্রদেবতার নামে শপথ করিয়ে যাচ্ছি।

ঃ না দাদাবাবু, মিটিংএ মুই যেতে পারব না। ও আদেশটি করবেন নি। সাত-সাতটা ছাওয়ালপান লয়ে ক'নে যাবো? আরে মিটিং ফিটিং দিয়ে কি করব, পেটে খাতি পাইনে, তা ওর বক্তিমে ছাই শুনে হবে কী?

ঃ তুমি বলছ কী গহর মিস্ত্রী!...যুবকটির কণ্ঠে ব্যাকুলতার সুর বেজে উঠ্‌ল।

মুখখানি একটু কোঁচকাইয়া গহর জবাব দিল ঃ আরে ঠিকই কই।

মিটিং করলে খাতি দিতে পারবেন? যান্ যান্ সইরা পড়েন—বলতে বলতে ফারনেসের দরজাটা খুলে খানিকটা কাঁচা কয়লা গ্রেটে ক'রে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করল।

ঃ তুমি ভুলে যাচ্ছ গহর, আজ মিল ষ্ট্রাইক্ ক'রে যদি ওদের জানতে দেও ওদের ক্ষিদের মত তোমাদের পেটেও ক্ষিদে আছে, কাজে গা দেবে না, তবেই ওরা তোমাদের কথা শুনতে পথ পাবে না। আরে শক্ত যে, তাকে ঠকাতে হলে শক্তিরই প্রয়োজন; আরে বক্তিমে যে বুঝি না তা ত' নয়! মুস্কিল হচ্ছে কাজ করা।

ব্রজেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন।

একটা মস্ত বড় প্যাকিংয়ের উপর দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে কারখানার একজন মজুর কী যেন সব বলছে, আর দশ-পনর জন তা'র চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে তাই হা ক'রে শুনছে। সকলেই এই কারখানার মজুর। যে লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছিল তা'র সর্ব্বাঙ্গে কালিঝুলি মাখা। গায়ের জামাটা শতচ্ছিন্ন, দেহের প্রায় অধিকাংশ প্রকাশ ক'রে দিয়েছে। মাথার চুলগুলি এলোমেলো। লোকটা বলছিল—

'ওদের বুকে যেমন খুসীর দেবতা আছেন, আমাদের বুকেও তেমনি দুঃখের দেবতা আছেন। খুসীর দেবতা হাসেন, তাই ওদের ঘরে অত হাসি, অত অজস্র আনন্দ। দুঃখের দেবতা কাঁদেন, তাই আমাদের ঘরে কান্না আর হাহাকার। আমাদের দেবতার চোখের জল মুছাতে হবে। আজ আমাদের ঘরে ঘরে ক্ষুধা মিটাবার মত এক মুঠো চাউলও নেই। আর ওদের ঘরে রাজভোগের ছড়াছড়ি।

কেন? কেন এ পার্থক্য? কেন আমরা পাব না? আমরা কী দোষ করেছি? এমন কী পাপ আমরা করেছি যার জন্য আজ আমরা এমনি অবহেলা পাচ্ছি? এমনি ঘৃণ্য ও পদদলিত কেন আমরা থাকব? আমরা অধিকার চাই, খাদ্য চাই।

জনতার মধ্যে একটা অস্পষ্ট গোলমাল জেগে উঠ্‌ল। ব্রজেন্দ্রনাথ চম্‌কে উঠ্‌লেন। ধূমায়িত বহ্নি সমস্ত আকাশ আজ ছেয়ে ফেলেছে, যেন আশু প্রলয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

কে একটি লোক চুপি চুপি সকলকে ছোট ছোট কাগজ বিলিয়ে বেড়াচ্ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথেব হাতেও এসে একখানি কাগজ দিয়ে গেল। ব্রজেন্দ্রনাথকে বোধ হয় চিনতে পারে নি—কেননা ব্রজেন্দ্রনাথ আজ সাধারণ বেশেই এসেছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ আলোর ধারে গিয়ে কাগজটা মেলে ধরলেন। লিখা ছিল:

জাগো বন্ধু! ঘুম হতে উঠ। এই ভারতভূমি—এতে সকলেরই সমান অধিকার। মানুষ মাত্রেরই আপন দেশকে ভালবাসবার সমান দাবী আছে!...... এমন আরও কত কি।

কাউন্সিল ঘরে ঢুকে ব্রজেন্দ্রনাথ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন, এই মিলের এক-চতুর্থাংশেরও বেশী শেয়ার তা'র একার।

সমস্ত কুলি-গ্যাং আজ ক্ষেপে উঠেছে। কেমন ক'রে কোন্ ফাঁক দিয়ে যে এ 'বেনো-জল' ঘরে এসে ঢুকেছে তা খুব স্পষ্টভাবে বুঝা না গেলেও, এটুকু বোঝা যায় যে কতকগুলি তরুণ ছেলেই এর জন্য দায়ী। তা'রাই কুলিবস্তীতে এসে নৈশবিদ্যালয় ক'রে

তাদের মাথার মধ্যে এই শিক্ষার বীজ বপন করেছে। আজ কুলি-গ্যাং বলছে, তাদের সামান্য মজুরীতে আর নাকি পেট ভরছে না। তা'রা যে পচাবস্তীতে থাকে তাতে নাকি স্বাস্থ্য টেকে না—রোগে ভুগতে হচ্ছে প্রতিদিন। তাদের দাবী আজ অসংখ্য। ক্ষুধার আহার, লজ্জা নিবারণের বসন, শয়নের স্থান…! আরও কত কি?

কর্ত্তৃপক্ষ অনেক গবেষণা ও অনেক আলোচনার পর স্থির করলেন, মজুরদের দাবী অন্যায্য—তাই ও-দাবী মেটাবার প্রতি তাদের এতটুকু দৃষ্টি দেবার ক্ষমতা নেই।

রাত্রি প্রায় একটার সময় ব্রজেন্দ্রনাথ গাড়ীতে এসে উঠে বসলেন। সেই অতি সঙ্কীর্ণ কর্দ্দমাক্ত পথের উপর দিয়ে তা'র গাড়ী এগিয়ে চলেছে। চিন্তিত ব্রজেন্দ্রনাথ আজ অত্যন্ত অন্যমনস্ক। অন্ধকার বাঁশ ঝাড়ের ভিতর হতে নৈশ হাওয়ায় একটা সিপ্ সিপ্ আওয়াজ ভেসে আসছিল।

সহসা কিসে বাঁধা পেয়ে ব্রজেন্দ্রনাথের গাড়ী থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠ্‌ল, মুহূর্ত্তে তিনি ব্রেক কষলেন। কিন্তু তার আগেই দশ-বারটা বাঁশের লাঠি গাড়ীর বডির উপর এসে সজোরে আঘাত করল। প্রথম আঘাতেই সামনের আলো ছুটো চুরমার হয়ে নিভে গেল। ব্রজেন্দ্রনাথ এক ধাক্কা দিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে নীচে এসে দাঁড়ালেন এবং বজ্রগম্ভীরস্বরে হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন: খবরদার! মাথার ভয় থাকে ত' আর এক পা-ও এগিও না।

একটা লাঠির আঘাত এসে তা'র কাঁধের উপর পড়ল। একটা ডান হাতের উপর।

ব্রজেন্দ্রনাথ মত্ত সিংহের মতই সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। আঁধারেই আক্রমণকারীদের একজনের উপরে গিয়ে পড়লেন। লোকটার হাতটা ভাল ক'রে ধরবার আগেই আরো চার পাঁচটা লাঠির আঘাত দেহের উপর এসে পড়ল। অন্ধকারে ব্রজেন্দ্রনাথ যত ক্ষিপ্রহস্তে আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে ব্যস্ত হচ্ছেন, চারপাশ হতে ততই তা'র উপর লাঠির আঘাত এসে পড়ছে। সহসা একটা লাঠির আঘাত জোরে মাথার উপর এসে পড়ল'। ব্রজেন্দ্রনাথের মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠ্‌ল। সমস্ত দেহ অবসন্ন হ'য়ে এল।

সহসা একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক হাসির উচ্চশব্দ ও উল্লাস ধ্বনি শোনা গেল—হাঃ হাঃ হাঃ ··

ব্রজেন্দ্রনাথ পড়ে গেলেন।

---

# আঠার

সন্ধ্যা হতে আর খুব বেশী দেরী নেই। ছাতের আলিসার উপর ঝুঁকে পড়ে অমিতা পশ্চিম আকাশের যেখানটা দিন শেষের রংয়ের খেলায় ঝিল্‌মিল্‌ করছিল, সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। বাড়ীতে আজ সে একা!

বাঁশবেড়ে মিলে কি একটা নাকি গোলমাল বেঁধেছে, লোকের মুখে খবর পেয়ে এই অল্প কিছুক্ষণ আগে কাকামণি, প্রফুল্ল ওরা সব চলে গেল।

কুলি গ্যাং ক্ষেপে গেছে; মারপিটেরও নাকি সম্ভাবনা আছে। অর্জ্জুন এসে অমিতার পিছনে দাঁড়াল।

ঃ অমিতা!

ঃ কে? অর্জ্জুন! ওখানকার খবর কিছু পেলে?

অর্জ্জুন অমিতার কথার প্রত্যুত্তরে মাথাটা ঈষৎ একটু হেলিয়ে যেন হাসবার বৃথা চেষ্টা করল; বললেঃ না! নূতন খবর আর কি তুমি পাবার আশা রাখ অমি?...তারপর থেমে আস্তে আস্তে বললেঃ মানুষের নেহাৎ রক্তমাংসের শরীর তাই রক্ষে! বেচারীরা ত' আর পাষাণ হতে পারে না। যা পারে সে ওই বোকার মতই মরতে; কিন্তু এই ভাবে মরার মধ্যে যে এতটুকু পর্য্যন্ত সার্থকতাও নেই। আমি শুধু ভাবি সেই চরম সত্যটা যেদিন ওদের চোখের পাতায় আলোর মত ফুটে উঠ্‌বে, সেদিন সমগ্র দেশ জুড়ে যে প্রলয়ের

দাবানল জ্বলে উঠ্‌বে,—সেদিনকার সে ধ্বংসলীলা যে আজ পর্য্যন্ত কোন দেশ, কোন জাতি রোধ করতে পারেনি, একথাটা কেন ওরা বোঝে না; অথবা বুঝেও না বোঝার ভাণ করে?

অথচ ওদের দাবী এমন কিছুই নয়; দু'মুঠো অন্নের কাঙ্গাল ওরা মাত্র! বেশী ত' ওরা চায় না; পেটের ক্ষুধা যে বড় ক্ষুধা! এই ক্ষুধার জ্বালাতেই মা তা'র সন্তানকে বিক্রী করে, ভাই ভাইয়ের বুকে অক্লেশে ছুরী চালায়। এই ক্ষুধার জ্বালাই মানুষের বুকের স্নেহ, প্রীতি, মায়া, শিক্ষা, কৃষ্টি সব কিছুই পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে যায়। সেদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে ফরাসী বিপ্লবের পাতায় পাতায় এই ইতিহাসেরই এক নিদারুণ অধ্যায় পড়ছিলাম, সে যেমনি করুণ তেমনই ভয়ঙ্কর!

চাকর রঘু এসে বললে: কে একটি দিদিমণি এসেছেন; অমুদিকে ডাকছেন!

: কে রঘু! নাম শুনলে না?

: না!

বাইরের আলো একেবারে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে না গেলেও ঘরের মধ্যে এর মধ্যেই আঁধারটা বেশ জমাট বেধে উঠেছে।

অমিতা ও অর্জ্জুন ঘরে এসে প্রবেশ করল।

কে একজন রাস্তার দিকের জানালার শিক ধরে পিছনে ফিরে রাস্তার দিকে চেয়ে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়েছিল। আঁধারে তেমন স্পষ্ট চেনা যায় না।

অমিতাই প্রশ্ন করল: কে?

অর্জ্জুন এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে আলোর বোতামটা টিপে দিল, মুহূর্ত্তে ঘরের সমস্ত আঁধারটা কেটে গিয়ে ঘরটি আলোকিত হয়ে উঠ্ল।

ঃ আরে! এ যে রেণু!…অর্জ্জুন সোল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠ্লো।

অর্জ্জুনদা!…বিস্ময়ে আনন্দে রেণুর চোখ দুটো ঝল্‌মল্ ক'রে উঠ্ল।

ঃ কিন্তু তুমি কতক্ষণ রেণু? উপরে না গিয়ে এখানে একা দাঁড়িয়ে কেন ভাই?—শুধালে অমিতা।

রেণু এতক্ষণে এগিয়ে এসে অর্জ্জুনের একখানি হাত সস্নেহে চেপে ধরে অভিমান-স্ফুরিত কণ্ঠে বললে: কোথায় ছিলে দাদা! এমন ক'রে না বলে কয়ে কোথাও কেউ যায় নাকি? উঃ, মানুষকে তুমি কি ভাবাতে পার দাদা?

অর্জ্জুন হাসতে লাগল, বললে: আমি ত তোমাদের ঐ সব 'কেউ'র একজন নই দিদি, যে আমার জন্য ভাবনা হবে?……

বাবা নাকি আমার ছিলেন সৈনিক; আমি যখন মার পেটে, সেই সময় বাবা ফ্রন্টিয়ারে যুদ্ধে ব্যস্ত। আমার জন্মের দিন দুই আগে খবর এল বিপক্ষ দলের গুপ্ত ঘাতকের হস্তে বাবার মৃত্যু হয়েছে। সেই সংবাদ শুনে সেই যে অভাগিনী মা আমার অজ্ঞান হলেন, সে লুপ্ত জ্ঞান আর ফিরে এল না; পরের দিন গভীর রাত্রে বম্বের এক হাসপাতালে আমার জন্ম দিয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

জ্ঞান যখন হলো, বুঝতে যখন শিখলাম, তখন এক অনাথ আশ্রমে আমি মানুষ হচ্ছি। হোষ্টেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ সিং দেখতে ছিলেন

যেমন মোষের মতো কালো ও মোটা, হৃদয়টা ছিল তা'র তেমনি নেক্‌ড়ের মতই হিংস্র ও ভয়াবহ।

হোষ্টেলের ছেলেরা তা'র অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে গেলেও মুখ বুজে সব কিছুই সহ্য করত, কেননা মা-বাপ-হারা যে হতভাগারা সেখানে থাকত, তাদের এর চাইতে ভাল ব্যবস্থা আর কি হতে পারে! দিনের পর দিন এই ভাবে অন্যায় অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে আমাদের দিন কাটত। তা'র শাস্তির বহরটা ছিল বড় ভয়ঙ্কর—তিন দিন এক বেলা মাত্র একবাটি ক'রে জলো বার্লি আর পঁচিশ ঘা ক'রে বেত।— এ শাস্তি সে ছোটবড় যে কোন অপরাধীর জন্যই দিত; সিংয়ের কোয়ার্টারের সামনে ছিল একটা ছোট ফুলের বাগান, আশ্রমের ছেলেদেরই সেই বাগানটার সকল তত্ত্বাবধান করতে হতো। একদিন শীতের সকালে; সেদিন বাগানের মাটি কোপানর ডিউটি ছিল আমার; আগের দিন রাত্রে জ্বর হয়েছে; সেইজন্য বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে পারিনি, সকাল আটটায় সিংএর ঘর হতে আমার ডাক এল, জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে তা'র কাছে গিয়ে হাজির হলাম; বজ্রগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন হলো, আমি আমার কর্ত্তব্য করি নি কেন? অভিযোগের কোন উত্তরই সে মান্‌লে না; সেই জ্বরের উপরেই সে আমার সর্ব্বাঙ্গে বেত চালাতে লাগল।

ঃ উঃ!…রেণু অস্ফুট একটা চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল।

অর্জ্জুন একটু হাসল।

তারপর আবার বলতে সুরু করল ঃ বরাদ্দ পঁচিশ ঘা বেতের দশ ঘায়েই আমি বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম; কিন্তু সেই বেতের

আঘাতে আমার বুকের ঘুমন্ত দেবতা উঠ্‌ল জেগে; পরের দিন আরো জ্বর বাড়ল! ক্রমাগত দশদিন যাবৎ ভুগে সেরে উঠ্‌লাম।

তারপর একদিন; সেটা বোধ হয় একটা রবিবারই হবে। সিং সাহেবের কোয়ার্টারে সেদিন স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা উঠেছে; আমাদের আশ্রমটা ছিল টাউন হতে মাইল দশেক দূরে সমুদ্রের কিনারে। আশ্রম হতে একটা ঢালা বালির স্তর গিয়ে বরাবর একেবারে সমুদ্রের মাঝে হারিয়ে গেছে। মাটির পৃথিবী যেন অসীম জলধিকে দু-হাত বাড়িয়ে কোল দিয়েছেন।

প্রত্যেক রবিবার সিং সাহেবের ঘরে উৎসবের আয়োজন হয়, টাউন হতে অনেক বন্ধুবান্ধব আসত, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত খাওয়া-দাওয়া ও গান-বাজনা চলত।

সে রাত্রেও যখন স্ফূর্ত্তি একেবারে পূরোদমে চলছে, আমি লাইব্রেরী রুম হতে ছেলেদের যে চাবুকটা দিয়ে মারা হত, সেটা শক্ত ক'রে হাতে চেপে সিং সাহেবের ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম।

সিং সাহেব ঐ সময়ে আমায় ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখে হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল: What's?

আমি আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না ক'রে সপাং ক'রে সিংএর মুখে একটা চাবুক বসিয়ে চীৎকার ক'রে বললাম, Nothing particular! তারপর এলোপাথারি তাকে পঁচিশ ত্রিশ ঘা চাবুক মেরে ছুটে ঘর হতে বেড়িয়ে এলাম।

এতক্ষণ ঘরের লোকগুলি যেন অবাক হয়েই আমার কাণ্ড-কারখানা দেখ্‌ছিল। আমি চাবুকটা হাতে ক'রেই সোজা সমুদ্রের

দিকে ছুট্‌লাম! আশ্রমের চাকর-বাকরেরা ততক্ষণে সিং ও অন্যান্য অভ্যাগতদের গোলমালে ঘরের চারপাশে এসে জড়ো হয়েছে। চারিদিকে থম্‌ থম্‌ করছে অন্ধকার!

সমুদ্রের কালো জলে ভাঙ্গা ঢেউয়ের বুকে সাদা ফেনার মালা কেমন যেন চাপা হাসি হাসছে!

আমি সোজা গিয়ে জলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

আমি সাঁতার দিয়ে এগিয়ে চললাম!

সেদিন রাতের নিঃসঙ্গ আঁধারে সাগর জলে ভাসতে ভাসতে একটি কথাই আমার খালি মনে হতে লাগল,—এত বড় বিশাল বিশ্বে আমি একা! আমার কেউ নেই!

আজও আমি সেই ধারণা নিয়েই বেঁচে আছি রেণু! এবং সে যে আমার কতবড় সান্ত্বনা তা তোমাদের বুঝিয়ে বলতে পারব না দিদিমণি!...বলতে বলতে অর্জ্জুন চুপ করল।

ইতিপূর্ব্বে কেউ কোন দিনই অর্জ্জুনের মুখে তা'র জীবনের ইতিহাস শোনেনি, বরাবরই সে ঐ দিকটা অতি যত্নে চাপা দিয়ে এড়িয়ে গেছে। আজ সহসা কথার ফাঁকে তার খানিকটা অর্জ্জুনের মুখ দিয়ে বেড়িয়ে এল; তার প্রচ্ছন্ন ব্যথার সুর যেন ঘরের মধ্যস্থিত সব কয়টি প্রাণীর বুকের মাঝেই একটা প্রচণ্ড দোলা দিয়ে গেল!

অর্জ্জুনলালের কথা শুনতে শুনতে রেণুর দু'চোখের কোল বেয়ে ফোঁটার পর ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ছিল; সহসা সেদিকে নজর পড়তেই অর্জ্জুনলাল হেসে উঠ্‌ল, তারপর্‌ গভীর স্নেহে

রেণুর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বললেঃ এই সামান্য কথাতেই কেঁদে ভাসিয়ে দিলি দিদি ; ওরে, তোরা দেখতে চাস্ না তাই, নইলে এর চেয়েও গভীর দুঃখ মানুষের বুকে জমাট বেঁধে আছে—যা শুনলে হয়ত পাষাণও ফেটে খান্ খান্ হয়ে যায়! না খেয়ে না খেয়ে ওদের সব শুকিয়ে গেছে! বুকের হাহাকার তাই আজ ওদের চোখের ব্যথার অশ্রু মরুভূমির মতই শুষে নিয়েছে।

কথায় কথায় এদিকে বেশ রাত হয়ে উঠেছে।

ওয়াল ক্লকটা ঢং ঢং ক'রে রাত্রি নয়টা ঘোষণা ক'রে দিল।

অর্জ্জুন রেণুর দিকে চেয়ে শুধালঃ বাড়ী ফিরবে না রেণু? রাত যে অনেক হলো। কিন্তু তুমি কার সঙ্গে এখানে এসেছিলে?···

ঃ বাবা একটা কাজে বের হচ্ছিলেন, যাবার পথে এখানে আমায় নামিয়ে দিয়ে গেছেন।—বললে রেণু।

ঃ ফিরবার পথে আবার নিয়ে যাবেন ত?—অমিতা শুধাল।

ঃ তা ত' জানিনা! সে সব কোন কথাই হয়নি।

ঃ তারপর?

ঃ কেন?···তুমি কি আমায় একটু পৌঁছে দিতে পারবে না দাদা?

ঃ আমি!···কিন্তু আমার যে বড্ড ঘুম পাচ্ছে দিদি?

বলতে বলতে সত্যি সত্যিই অর্জ্জুন সমগ্র শরীরটা শিথিল ক'রে পাশের একটা কোচের উপর এলিয়ে দিল।

ঃ ঘুম পাচ্ছে সত্যি? তা বেশ ত খানিকটা না হয় ঘুমিয়েই নাও, তারপর ঘুম ভাঙ্গলেই যাওয়া যাবে'খন।—রেণু বললে।

ঃ আর কালকের সকালের আগে ঘুম যদি না ভাঙ্গে?

ঃ কী আর এমন হবে? কাল সকালের আগে যাওয়া হবে না।—রেণু হাসতে হাসতে জবাব দিল।

অমিতা এতক্ষণ সকৌতুকে দু'জনের কথা শুনছিল; তারপর হাসতে হাসতে বললেঃ কেন ও পাগলটাকে ঘাটাচ্ছ অর্জ্জুন, রাত অনেক হয়েছে, যাও ওকে বাড়ী দিয়ে এস।

অর্জ্জুন অমিতার মুখের দিকে তাকাল। কী একটা প্রশ্ন ওর চোখের সমগ্র দৃষ্টিটুকু জুড়ে ভেসে উঠ্‌ল।

ঃ কিন্তু, তা ত' হয় না অর্জ্জুন? তুমি না গেলে আমারই যেতে হয়।···অমিতা বললে।

এবার আর অর্জ্জুন আপত্তি করলে না। তাড়াতাড়ি কোচ ছেড়ে উঠে পড়ে বললেঃ প্রস্তুত! চল দিদি!

অর্জ্জুন আর রেণু যখন রাস্তায় এসে নামল, রাত্রি তখন গভীর হয়ে এসেছে।

এস্‌প্লানেড্‌ অভিমুখী একটা ট্রামে দু'জনে চেপে বসল।

---

# উনিশ

ব্রজেন্দ্রনাথের লুপ্ত জ্ঞান যখন ফিরে এল, তিনি দেখলেন তার হাত-পা দেহ সমস্তই শক্ত মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা; এমন কি, একটু নড়বার চড়বার পর্য্যন্ত উপায় নেই!

ব্রজেন্দ্রনাথ চোখ মেলে চারিদিক ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। পিপাসায় কণ্ঠতালু শুকিয়ে উঠেছে। জিভ্‌টা ভিতরের দিকে টেনে টেনে ধরছে।

ঘরের এক কোণে একটা কেরোসিনের কুপি দপ্‌ দপ্‌ ক'রে জ্বলছে। কে যেন একজন দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুজে চুপটি ক'রে বসে আছে।

লোকটার আকৃতি দেখলে তা'র শারীরিক আসুরিক শক্তিকে কিছুতেই ভুল করা যায় না।

বাইরে অন্ধকার। মাঝে মাঝে শুক্‌নো পাতার উপর কাদের নিঃশব্দ পদসঞ্চার খস্‌-খস্‌ ক'রে আওয়াজ তোলে।

বিশ্রী একটা ভাপসা পঁচা দুর্গন্ধে নাক জ্বালা করে।

ঃ এই তুই কে?...

ব্রজেন্দ্রনাথের ডাকে লোকটা কোন সাড়াই দিল না; যেমনি মাথা গুজে একধারে নিঝুমভাবে বসেছিল, তেমনিই রইল। বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছে।

ঃ এই শুন্‌ছিস্‌? এই?

এবারে লোকটা মুখ তুললেঃ কী চেঁচাও কেনে?—লোকটার গলার অতি কর্কশ ও রুক্ষ স্বর যেন কাংস্যপাত্রের মত ঝন্‌ ঝন্‌ ক'রে উঠ্‌ল।

ঃ চুপ ক'রে ঘুমাও! ওরা এল বলে!

সহসা পিছন দিক হতে অন্ধকারে কার তীক্ষ্ণ সরু কণ্ঠস্বর শোনা গেলঃ কি বলে রে বিষ্টু?···তারপর কতকটা যেন আত্মগত ভাবেই বলে উঠ্‌লঃ কি গো রাজাবাবু? ঘুম বুঝি এস্‌তিছে না? তা তোমাগোর সে রাজপালঙ্ক মোরা গরীব কুলী লোক পাই কনে কওদি?—একটা বিষাক্ত শ্লেষ যেন লোকটার প্রতি কথার মাঝে মনে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

ব্রজেন্দ্রনাথের আকণ্ঠ পিপাসাও বুঝি মুহূর্ত্তে গলার ভিতরে শুকিয়ে কাষ্ঠ হয়ে যায়! পায়ের উপর ও নাকের ডগায় কয়েকটা মশা হুল বসিয়ে নির্ব্বিবাদে রক্ত শোষণ করছে; সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছে।

অতি কষ্টে ব্রজেন্দ্রনাথ করুণ মিনতি জানালঃ একটু জল!···

ঃ জল! দেরে বিষ্টু, ওই ঘড়ায় জল আছে, বাবুর মুখে একটু ঢেলে দে!

লোকটা একটা মাটির পাত্রে ক'রে খানিকটা জল গড়িয়ে নিয়ে এলঃ নাও, হাঁ কর!···

পিপাসার্ত্ত ব্রজেন্দ্রনাথ হাঁ করলেন, লোকটা জল ঢালতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথের নাকে, চোখে মুখে ফেলে দিল।

নাকে চোখে মুখে জল যাওয়ায় দম্ আটকে আসে। ব্রজেন্দ্রনাথ অসহায়ের মত মুখটা সরিয়ে নিতেই লোকটা একটা পৈশাচিক আনন্দে হাঃ হাঃ ক'রে হেসে উঠ্ল!…

ওপাশ হতে আবার প্রশ্ন এলোঃ কিরে হাস্তিছিস কেনে?

ঃ রাজাবাবু যে খাবি খায়!…

বাইরে কাদের অস্পষ্ট কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যায়। কারা বুঝি এ'দিকেই আসছে না?

পায়ের শব্দ ক্রমে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়।

কয়েকটা লোক একটা ধূমায়িত হারিকেন হাতে ঘরে এসে প্রবেশ করল।

লোকগুলি ঘরে ঢুকে একবার ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে একধারে সব বসে কি সব কথাবার্তা বলতে লাগল।

আলোটার চারপাশে কয়েকটা পোকা উড়ে উড়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

অসহ্য রাগে ও নিষ্ফল বেদনায় ব্রজেন্দ্রনাথ ফুলে ফুলে উঠ্ছিলেন। এক সঙ্গে অনেক দিনের অনেক কথাই আজ বারবার তা'র মনের কোণে উঁকি দিয়ে যেতে লাগল।

যে অর্থের জন্য একদিন তিনি মানুষের বুকের উপর দিয়ে অক্লেশে হেঁটে চলে এসেছেন, সেই অর্থ আজিও তার সিন্দুক ভরাই আছে; মানুষের অর্থই ত' সব; তবু তা'র এ অপমান ও ক্লেশ কেন? এ পরাজয়ের দুঃসহ গ্লানি কেন?…

তিনি ডাকলেন: ওহে শুনছো?…

দলের মধ্যে বুড়ো মত একজন ছিল, সে মুখ বাড়িয়ে প্রশ্ন কর্‌ল : কি ?

: তোমরা কত টাকা চাও বল ? আমায় মুক্তি দাও, তোমরা যা চাও আমি তাই দিচ্ছি !

: এর মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠেছ বাবু ?...

: বল, শীঘ্র বল ! আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে এই বিশ্রী ঘরে। কত টাকা চাও বল ?...

: টাকা ?...কিসের ?

: হাঁ টাকা ! পাঁচ হাজার। দশ হাজার !...

লোকটা চুপ ক'রে রইল।

: বেশ, বিশ হাজার দেব ;

এবারও লোকটা কোন জবাব দিল না !

: পঞ্চাশ হাজার !...বল, বল কত চাও ?—ব্রজেন্দ্রনাথ চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন।

বুড়ো মাথাটা হেলিয়ে জবাব দিল এতক্ষণে : সে আর হয় না বাবু ?...যে আগুন আজ জ্বলেছে, লক্ষ টাকাতেও আজ আর সে আগুন নেভান যাবে না !...সে আগুনে সব্বাইকে পুড়ে মরতে হবে ! মিল—মিলের টাকা, তার কর্ত্তারা, তুমি এবং আমরা সকলে ; কারও নিস্তার নেই ! সবাই আমরা মরব !

: মৃত্যু !...

ব্রজেন্দ্রনাথের কানের মধ্যে কে বুঝি গরম সীসা ঢেলে দিল ! ..
ঐ ত চোখের সামনে দিয়ে মৃত্যু এগিয়ে আসছে !

ঐ ত দিকে দিকে আজ তার প্রলয়ের দুন্দুভি বেজে উঠেছে !
কারোই রক্ষা নেই ; মরবে ! সবাই আজ মরবে !
চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে !…
কানের মধ্যে তালা ধরেছে ; কিছুই ত' শোনা যায় না !…

সহসা কে একজন এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরের মধ্যে একপ্রকার ছুটে এসে ঢুকল ঃ আগুন ! আগুন !…

যুগপৎ ঘরের সব কয়টি প্রাণীই চম্‌কে উঠ্‌ল ঃ আগুন ! কোথায় ?

ঃ শীঘ্র পালাও !…বাতাসে আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে !

লোকগুলি একটা অস্ফুট চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল ! পরক্ষণেই এক সাথে সব ছুটে ঘর হতে বেরিয়ে বাইরের সীমাহীন আঁধারে মুহূর্ত্তে মিলিয়ে গেল !

আর ব্রজেন্দ্রনাথ !

একাকী হাতপায়ে বন্ধন নিয়ে ঘরের মধ্যে পড়ে রইলেন।

# কুড়ি

বাঁশবেড়ে মিলে কুলিগ্যাং ও কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে যে সংঘর্ষ বেঁধেছিল, সেটার একটা আপোষ নিষ্পত্তিই চেয়েছিল কুলিগ্যাং! কিন্তু দীর্ঘ আলোচনার পর কাউন্সিল রুম থেকে যখন কর্ত্তৃপক্ষরা তাদের দাবী অগ্রাহ্য করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বেরিয়ে এলেন, কথাটা মুহূর্ত্তে আগুনের মতই সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। শ্রমিকেরা কর্ত্তৃপক্ষদের মনোভাব আগে হতেই কতকটা আঁচ করেছিল, এবং তার জন্য তা'রা আগে হতেই প্রস্তুত হয়েছিল।

কর্ম্মায়তন সঙ্ঘের যে ছেলে কয়টি বাঁশবেড়েতে ছিল, তা'রা কুলিদের মনের রুদ্র রূপ দেখে তখুনি কাকামণির কাছে খবর পাঠাল।

খবর পাওয়া মাত্রই কাকামণি প্রফুল্লকে সঙ্গে ক'রে গাড়ীতে বাঁশবেড়ে চলে এলেন।

কাকামণি যখন মিলের দরজার কাছে এসে গাড়ী হতে নামলেন, কাউন্সিল ঘরের মিটিং তখন শেষ হয়ে গেছে। মিলের লৌহ দরজার কাছে আঁধারে একদল কুলি দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কি সব জটলা পাকাচ্ছে!

কাকামণির মনের গোপন কোণে যে কল্পনা এতদিন কল্পনাতেই পর্য্যবসিত ছিল, সে যে সত্যসত্যই এমনি ক'রে একদিন ব্যথায় ফুটে উঠ্‌বে, এ যে তিনি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি!

আনন্দে ব্যথায় তাঁর দু'চোখের কোল বেয়ে ফোঁটার পর ফোঁটায় অশ্রু নেমে এল।

কঠিন শিলার বুক হতে নির্ঝরিণী আজ দুকূল প্লাবিয়া বয়ে এল, তার জন্য তা'র মাথাটা যেন আজ সত্য সত্যই সেই সর্ব্বনিয়ন্তার চরণোদ্দেশে নুয়ে এল!

পাষাণের ঘুম আজ ভেঙ্গেছে।

কুলিদের মুখেই কর্ত্তৃপক্ষের চরম নিষ্পত্তির কথা শুনে কাকামণি কুলিদের আপাততঃ কিছুক্ষণের জন্য থামতে বলে, মিলের এক দারোয়ানের হাতে মিলের বড় সাহেবের কাছে এক চিঠি পাঠিয়ে দিলেন, মিল সংক্রান্ত ব্যাপারেই যে গুরুতর আলোচনা তিনি এক্ষুনি সাহেবের সঙ্গে করতে চান, তাও কাগজে লিখে দিলেন!

একটু পরেই সাহেবের কামরা হতে কাকামণির ডাক এল।··· কাকামণিকে ঘরে ঢুকতে দেখে সাহেব ইসারায় একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল।

কাকামণি চেয়ারটার উপরে গিয়ে বসলেন।

কাকামণি বললেন : সাহেব এখনও সময় আছে, থামো! ওদের শান্ত কর!···একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে কি ভুল তুমি করতে চলেছ!

রাগে সাহেবের সর্ব্বশরীর বার বার কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ছিল; দাঁতে দাঁত চেপে চাপা কর্কশ কণ্ঠে সাহেব জবাব দিল : বাবু, আমি জানি; খবরও রাখি সব কিছুরই! যারা চিরটা কাল ধরে একমাত্র চাবুকের তলাতেই পিঠ পেতে এসেছে, আজ যে তা'রা এতটা সাহস

কোথায় পেলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার মত, তাও আমি জানি। শুধু আমার নয়, এটা মিলের সমস্ত কর্তৃপক্ষের স্থির সঙ্কল্প যে, একদিন কেন একমাস মিল বন্ধ ক'রে রাখলেও তাদের এতটুকু ক্ষতি হবে না। ওরা বুঝতে পারছে না, কিন্তু আমি জানি আসলে ক্ষতি যদি কারও হয় এই ব্যাপারে তা ওদেরই। ওরা বুঝতে পারছে না যে আজ ওদের যারা এমনি ক'রে ক্ষেপিয়ে তুলেছে, তা'রা জানে শুধু ক্ষেপাতেই, গলাবাজীই তাদের সম্বল। কিন্তু গলাবাজীতেই পেট ভরে না বাবু? দু' দিন মিল বন্ধ থাকলে আমাদের না খেয়ে মরতে হবে না; কেননা আমাদের ঘরে ভাত যথেষ্টই আছে; কিন্তু ওদের না খেয়েই মরতে হবে!

কাকামণি হাসলেন, বড় দুঃখেই আজ তা'র হাসি পাচ্ছিল।

ঃ তুমি জাননা সাহেব এদেশের লোক মরতে কত সহজে পারে! কিন্তু তুমি এখনও বুঝে দেখ!

সাহেব রুক্ষস্বরে জবাব দিলঃ অনেক বিবেচনা করা হয়েছে। তাদের বলগে ভাল চায়ত' এ মতলব ওরা ছেড়ে দিক্! নচেৎ আমিও জানি চাবুক কেমন ক'রে চালাতে হয়!...

এমন সময় একটা ক্রিশ্চান ফোরম্যান একটা কুলীর ঘাড় ধরে টানতে টানতে সাহেবের কামড়ার কাছে নিয়ে এল। সাহেব শুধালঃ কি ব্যাপার জিম!

ঃ এই লোকটাকে মেসিনে তেল দিতে বল্‌ছি, তা ও কিছুতেই শুনছে না।

ঃ শুনছে না! আচ্ছা দাঁড়াও!—সাহেব চেয়ার হতে উঠে

দেওয়ালে টাঙ্গানো একটা চাবুক পেরে নিয়ে কুলিটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করল ঃ মেসিনমে তেল দিয়া নেই কাহে?

কুলি নীরবে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

ঃ এই শোনতা হ্যায়!...এই উল্লু!...সাহেব চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল! কিন্তু তথাপি কুলি নিরুত্তর।

সহসা সাহেবের হাতের চাবুক সপাং ক'রে গিয়ে কুলিটার পিঠে পড়ল!

কুলিটা আর্ত্তস্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল; কিন্তু সাহেবের হাতের চাবুক তখন সপাং সপাং ক'রে কুলিটার সর্ব্বাঙ্গে বর্ষিত হচ্ছে!

চাবুকের ঘায়ে জর্জ্জরিত কুলিটা রক্তাক্ত দেহে সেইখানে লুটিয়ে পড়ল।

কাকামণি এতক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে পরম স্নেহে কুলিটার রক্তাক্ত জ্ঞানহীন দেহটা আপন বুকের উপর তুলে নিলেন।

ঃ যাও বাবু, কুলিদের বলগে, এ দেখে তা'রা যেন সাবধান হয়।...

কাকামণি একবার মাত্র সাহেবের দিকে চেয়ে ধীরপদে ঘর হতে বের হয়ে এলেন।

---

# একুশ

রাত্রি তখন প্রায় বারোটা হবে !

কাকামণি বস্তীর একটা ঘরে জ্ঞানহীন কুলিটার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত। কর্ম্মায়তন হতে ইতিমধ্যে আরো অনেকেই এসেছে, শ্যামলও বাদ যায়নি।

সহসা একটা চাপা গোলমাল কাকামণির কাণে এল।

গোলমাল ক্রমেই যেন বেড়ে চলেছে।

কিসের যেন একটা চাপা ভয়াবহ ইঙ্গিত রাতের আঁধারে চুপি চুপি বুঝি এগিয়ে আসছে।···

এমন সময় একটা লোক ছুটে এসে ঘরে ঢুকল : আগুন ! আগুন !

আগুন !···সকলে চম্‌কে উঠ্‌ল !

: পালাও ! পালাও ! আগুন ! আগুন !···

সত্যই আগুন !

আগুনের সহস্র লেলিহান শিখা রাতের আঁধারকে যেন রক্তাক্ত ক'রে তুলেছে !

মিলের এক পাশে আগুন লেগেছে।

ফট্ ফট্ শব্দে কাণে যেন তালা ধরে।

গোলমাল···চীৎকার !···চারিদিক যেন ভয়ে শিউরে উঠ্‌ছে।

ক্রমে দেখতে দেখতে আগুন ছড়িয়ে পড়তে লাগল !

বড় বড় পাইপে জল ছড়ানো হতে লাগল ; কিন্তু আগুন ক্রমেই দুর্ব্বার হয়ে উঠ্‌তে লাগল। যেন ধ্বংসের দেবতা প্রলয় নাচন সুরু করেছেন।

ক্রমে বাতাসে মিল-সংলগ্ন কুলি বস্তীও আগুনের ছোঁয়ায় জ্বলে উঠ্‌ল !

হতভাগ্যদের দীর্ণ আর্ত্তনাদে আকাশ বাতাস ভরে উঠ্‌ল। কর্ম্মায়তনের সকলে ছুটাছুটি ক'রে যথাসাধ্য সকলকে সাহায্য দান করতে লাগল।

শ্যামল ও অমিয় একটা বুড়ীকে ঘর হতে টেনে বের করছিল, এমন সময় ছোট্ট একটি শিশুর আর্ত্ত চীৎকারে দু'জনে চম্‌কে উঠ্‌ল ! পাশের যে ঘরটা আগুনে গ্রাস করছে, হয়ত বা সেই ঘর হতেই চীৎকার আসছে, হতভাগিনী জননী হয়ত প্রাণের ভয়ে সন্তান ফেলেই পালিয়েছে।

শ্যামল সেই চীৎকার লক্ষ্য ক'রে সেই ঘরের দিকে ছুটে গেল। সত্যই, অসহায় এতটুকু একটি শিশু চারিদিকে আগুনের বীভৎস লীলা দেখে ভয় পেয়ে কাঁদছে ! সস্নেহে শ্যামল শিশুটিকে বুকের উপর তুলে জড়িয়ে ধরল। তাড়াতাড়ি অগ্নিদগ্ধ কবাটটা পেরুবার আগেই, সেটা সশব্দে শ্যামলের মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ল। একটা করুণ চীৎকার শুধু বারেকের তরে নৈশ আকাশে শত সহস্র পীড়িতের আর্ত্তনাদের সাথে সাথে উঠে পুনরায় আবার তখুনি মিলিয়ে গেল।

ঃ ওরে কে কোথায় আছিস, আমায় বাঁচা !···পুড়ে মলাম !—কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের সে চীৎকারে কান দেবে এমন লোক বুঝি আজ বিশাল বিশ্বে কেউই নেই !···

চারিদিকে আগুনের ধ্বংসলীলা !

অসহ্য গরমে সমস্ত শরীর যেন ঝলসে যাচ্ছে !

অসহায় ব্রজেন্দ্রনাথ শক্ত দড়ির বাঁধনে আজ একটি ছোট্ট শিশুর মতই বুঝি অসহায় !

মরণাধিক যন্ত্রণায় ব্রজেন্দ্রনাথ ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন।

···সহসা উপর হতে একটা জ্বলন্ত কাঠ খসে ব্রজেন্দ্রনাথের গায়ের উপর পড়ল। ব্রজেন্দ্রনাথ চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন! দাউ দাউ ক'রে মুহূর্ত্তে গায়ের জামা কাপড় জ্বলে উঠ্‌ল ! এমন সময় কার যেন কণ্ঠস্বর শোনা গেল ঃ ভয় নেই !···তারপর আর ব্রজেন্দ্রনাথের কিছুই মনে নেই !

পরের দিন বেলা প্রায় নয়টার সময় আগুন নেভান হলো।

চতুর্দ্দিকে দগ্ধ—অর্দ্ধদগ্ধ—বিক্ষিপ্ত স্তূপের বোঝা।

বিশ্রী উৎকট গন্ধে নাড়ী যেন পাক দিয়ে উঠে !

হতাহতের করুণ হৃদয়দ্রাবী আর্ত্তনাদ এখনও শোনা যায়। এ যেন সারাটা রাত্রি ধরে হাজার হাজার দৈত্য দানব এসে সমস্ত মিল ও কুলিবস্তীর উপর এক বীভৎস নৃত্যের মহড়া দিয়ে গেছে। কাকামণির দলের সকলেই প্রায় অল্পবিস্তর আহত। শ্যামলকে অনেক খোঁজাখুজির পর যখন পাওয়া গেল, তা'র সেই

প্রায় দগ্ধ মৃত্যুবিকৃত মূর্ত্তির দিকে চাইতেও গা শিউরে উঠে। ব্রজেন্দ্রনাথ গুরুতররূপে আহত হয়েছেন, তাকে হাসপাতালে কিছুক্ষণ আগে সরান হয়েছে! বাঁচবার আশা খুবই কম। চোখ দুটি গলে গেছে!

দেখতে দেখতে এ সংবাদ বিদ্যুতের মতই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

মালিকদের মধ্যে কেউই নাকি সে রাতে আর তাদের বাড়ী ফেরেন নি, এবং এখন পর্য্যন্ত তাদের কোন সংবাদও পাওয়া যায়নি।

এলো পুলিশ, কমিশনার সাহেবও এলেন।

মিটিং বসল।

বড় সাহেব স্পষ্টই কাকামণি ও তা'র দলের সমস্ত ছেলের নাম করলে! কমিশনার সাহেব তা'র নোট বুকে সব টুকে নিয়ে চলে গেলেন।

---

# বাইশ

দু'দিন পরে।

আপাততঃ সমস্ত গোলমাল কিছু মিটলে, কাকামণি ফিরে এলেন। হৃতসর্ব্বস্বের বেদনা আজ তা'র সমগ্র বুকখানাকে যেন তোলপাড় ক'রে তুলছিল। তা'র এতদিনকার সমস্ত সোনার স্বপ্ন একদিন অদূর ভবিষ্যতে এমনি ক'রেই পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়বে, দু'টো দিন আগেও ত তা তিনি ভাবতে পারেন নি।

শেষ!

হাঁ, আজ তা'র সবই একেবারে শেষ হয়ে গেছে।

নেই! কিছু এতটুকু বুঝি তা'র আজ অবশিষ্ট নেই।

সাঁঝের আঁধারে নিঃশব্দ পায়ে পায়ে কাকামণি কর্ম্মায়তনের দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

গোলমালটা না মিটে যাওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মায়তনের সমস্ত কাজই বন্ধ ক'রে রাখা হয়েছে। ছেলেরা সব কাকামণির গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। এখানে এখন শুধু অমরদার স্ত্রী ও মেয়ে পুতুল এবং পুরাতন দারোয়ান বলদেও সিং, চাকর শ্যামু।

গেটের একপাশে ছোট্ট কুঠুরীর মধ্যে একটা দড়ির খাটিয়ায় পূর্ব্বের মতই বলদেও প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, কাকামণিকে দেখে একটা সেলাম দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ভূতে-পাওয়া মানুষের মতই এক পা এক পা ক'রে কাকামণি লাল সুড়কী ঢালা সরু পথটি ধরে এগিয়ে চললেন।

কর্ম্মায়তনে আজ আর আলো জ্বলেনি।

রাত্রের অস্পষ্ট আঁধারে টিনের সেডের ঘরগুলি নিঃশব্দে একে একের গা ঘেঁষে ভূতের মতই যেন চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

এযেন সেই শিশুকালে রূপকথায় শোনা ডাইনীর মন্ত্রে ঘুমিয়ে পড়া রাজার পুরী।

কাকামণির সমস্ত বুকখানা তোলপাড় ক'রে একটা বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

নিঃশব্দে চলতে চলতে কখন একসময় গঙ্গার ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছেন।

রাত্রির আঁধারে বিশ্বচরাচর জুড়ে একটা অস্পষ্ট চাপা দ্যুতি যেন চারিদিকে ঘুমের মত ছড়িয়ে আছে।

চারিদিকেই একটা সুকঠিন মৌনতা।

ওই দূরে ওপাড়ে আঁধারে মিলের দীপালোকমালা সারি সারি মিটিমিটি জ্বলছে আর জ্বলছে।

সহসা একসময় কাকামণির নজরে পড়ল সিঁড়ির নীচে জলের একেবারে কোল ঘেষে চুপটি ক'রে কে একজন বসে।

ঃ কে ?...

একটু এগিয়ে এসে ভাল ক'রে দেখতেই বুঝতে পারলেন, সে পুতুল। কয়েকটা কথার অস্পষ্ট ধ্বনি তা'র কানে এসে বাজল, কাকামণি থমকে দাঁড়ালেন।

ঃ শ্যামল! শ্যামল! জানি না ভাই, তুমি আজ কোথায়, কত

দূরে ? পুতুলকে কি তোমার আর একেবারেই মনে নেই ভাই ! আমি যে তোমার নাম ধরে কত ডাকছি, কিছুই কি তুমি শুনতে পাও না।

কাকামণি ধীরপদে পুতুলের একেবারে পিছনটিতে এসে দাঁড়ালেন। নিঃশব্দে তা'র মাথার উপর একখানি হাত রেখে স্নেহসিক্ত স্বরে ডাকলেন: পুতুল, মা আমার !··· এখানে একলা এমনি ক'রে বসে কেন মা ? চল মা, ঘরে চল।

: কাকামণি !···পুতুল ডাক দিল।—আচ্ছা কাকামণি, মরে গেলে মানুষ কোথায় যায় ? শ্যামল বলত মরে মানুষ আকাশের তারা হয়, সত্যি কাকামণি তাই কি ?

: শ্যামল যখন বলে গেছে, নিশ্চয়ই তবে তাই হয়।—কাকামণি জবাব দিলেন।

: নিশ্চয়ই ! নইলে আকাশের ঐ বড় তারাটা ত' এতদিন ছিল না, হঠাৎ আজ ওটা দেখতে পেলাম; আর তারাটার দিকে চাইলেই আমার মনে হয় শ্যামলই যেন আমার দিকে চেয়ে চেয়ে আমায় কেবলই ডাকছে আর বলছে,—পুতুল এই যে আমি।

গভীর বেদনায় কাকামণির দু'চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটার পর ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

অদূরে পায়ের নীচে একটানা গঙ্গার স্রোত বয়ে চলেছে, কণ্ঠে তার কুলু কুলু ধ্বনি, বিরামহীন, বিশ্রামহীন।

শ্যামু এসে বললে: উকিলবাবু এসেছেন।

কাকামণি বললেন : চল যাই।

পিনাকী রায় মস্ত বড় ব্যারিষ্টার।

কাকামণির ছোটবেলার বন্ধু।

গাড়ী হতে নেমে আঁধারে পিনাকী রায় সুড়কী ঢালা পথটার উপর ইতস্ততঃ পায়চারী ক'রে বেড়াচ্ছিলেন।

: পিনাকী !···কাকামণি ডাকলেন।

: এই যে চৌধুরী।

: খবর কী পীনু !···

: তোমাদের againstএ ওরা যে সব সাক্ষী দেবে তাদের statement খুব strong নয়, মোকদ্দমা টিক্‌বে না ; তবে কুলিদের মধ্যে দু' চারজনের গুরুতর শাস্তিই হবে। কিন্তু তোমার এই কর্ম্মায়তনটিকে হয়ত তুলে দিতে হবে !

: কেন ? এই কর্ম্মায়তনের অপরাধ কি ?

: অপরাধ ! পিনাকী রায় হাসল। তারপর বললে, অপরাধ ত তোমার একটা নয়, অনেক, অনেক। অশিক্ষিত মূর্খ যারা তাদের তুমি শিক্ষা দিতে চেয়েছো ! তাদের ন্যায্য দাবী জানাবার মত সুর কণ্ঠে দিয়েছ। তাদের পেটের ক্ষিদের কথা যা তারা এতকাল তাড়ি ও মদের নেশা দিয়ে ঢাকতে চেয়েছে সেটাকে উস্‌কে জাগিয়ে দিয়েছ। মানুষ হবার মন্ত্র তাদের কাণে ঢেলেছ !···

কাকামণি এবার মৃদু হেসে জবাব দিলেন : অপরাধই বটে পীনু ! কিন্তু এবার বুঝি সত্যই আমার বিদায় নেবার সময় এলো !

পরম স্নেহে কাকামণির কাঁধের উপর দুটি হাত রেখে গম্ভীর কণ্ঠে

পিনাকী রায় বলল : সত্যই কি আজ কুরুক্ষেত্র রণে সব্যসাচী ক্লান্ত হয়েছে ভাই !···

অতি বড় ব্যথায় কাকামণির দু'চোখের কোণ বেয়ে দু' ফোঁটা জল নেমে এল। তারপর ধীরে ধীরে বলল : ক্লান্ত হইনি ভাই ; ক্লান্ত হব সেইদিন যেদিন মৃত্যু এসে তার নোটিশ জারী করবে, তার আগে নয় !

: কোথাও যাবে ?

: হাঁ ! তাই ভাবছি।

: আর কি ফিরবে না ভাই !

: ফিরব না ? একশ বার ফিরব ! হাজার বার ফিরব ! আমার জন্মভূমি ! আমার দোয়েল শ্যামার কলকাকলীতে মুখরিত চিরশস্য-শ্যামলা জননী ! সোনার দেশে এর নরম ঠাণ্ডা মাটির বুকে মাথা রেখেই আমি শেষ নিঃশ্বাস নিতে চাই ! এর নদ-নদী সুনীল আকাশ গিরি বনানী সে যে আমার জন্মজন্মান্তরের স্বপ্ন, একে ফেলে আমি কোথায় যাবো ?···বলতে বলতে গভীর বেদনায় তা'র কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

---

# তেইশ

তখন গভীর রাত্রি। খবর এল, ব্রজেন্দ্রনাথের অবস্থা নাকি খুব খারাপ। কাকামণি তাড়াতাড়ি হাসপাতালে ছুটলেন।

ভারী পর্দ্দাটা ঠেলে কেবিনে গিয়ে ঢুকলেন।

ঘরের মধ্যে একটা সবুজ ডুমে ঢাকা বৈদ্যুতিক বাতি হতে বিচ্ছুরিত ম্রিয়মাণ একটা আলোর আভা যেন মৃত্যুর মতই গভীর বেদনায় চারিদিকে ছড়িয়ে আছে!

পায়ের তলায় বসে অর্জ্জুন, মাথার কাছে বসে আনতমুখী রেণু!…

আহা!…

কাকামণি ধীরে ধীরে শয্যার পাশটিতে দাঁড়ালেন!

ঃ রেণু মা?…রোগীর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল।

ঃ বাবা?…

ঃ মাগো? কোথায় তুই,…আমি যে আর দেখতে পাই না,…আয়, কাছে আয়!…ব্রজেন্দ্রনাথের কথা কেমন যেন অস্পষ্ট ও জড়ানো!…

ঃ বাবা গো!…অসহ্য কান্নায় রেণুর কণ্ঠস্বর বুঝি ভেঙ্গে আসতে চায়!

ঃ কাকামণি এলেন!…

ঃ এই যে আমি এসেছি মিঃ সিংহ!…

কাকামণি এগিয়ে এলেন।

ঃ আমায় ক্ষমা করুন চৌধুরী!…ব্রজেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর অনুতাপের বেদনায় কেঁপে কেঁপে বুঝি ভেঙ্গে গেল।

ঃ কেন আপনি অধীর হচ্ছেন ?…স্থির হন !…একটু ঘুমোতে চেষ্টা করুন !

ঃ ঘুম !…বড ব্যথায়ই আজ ব্রজেন্দ্রনাথের বুঝি হাসি এল।…ঘুম ! এবার চির জীবনের ঘুমই ঘুমাব ! আজ এই মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বুঝতে পেরেছি ওদের বুকে কী ব্যথাই দিয়েছি এতকাল ! মানুষ হয়ে মানুষের বুকের 'পর দিয়ে চালিয়ে এসেছি অর্থের রথচক্র !… মানুষ হয়ে মানুষের বুকের ব্যথা বুঝিনি বলেই বুঝি ভগবানের অভিশাপ আমার মাথার 'পর ভেঙ্গে পড়েছে।…এই ভাল হয়েছে। হে ভগবান ! এই তুমি ভাল করেছো !…

ব্রজেন্দ্রনাথ গভীর শ্রান্তিতে হাঁপাতে লাগলেন !…

ঃ চুপ করুন ! কথা আর এখন বলবেন না !…

ঃ না—না ! আজ আর বাঁধা দেবেন না !…আজ আমায় বলতে দিন্ ! …আমার রেণু !…ওর যে কেউ রইল না কাকামণি !…মা আমার বড় অভিমানিনী !…

ঃ বাবা গো, একটু চুপ কর !…রেণু কান্নাভরা স্বরে বললে !

ঃ কাকামণি, রেণুকে আমার দেখবেন !…অর্জ্জুন !…

ঃ এই যে আমি—

ঃ কাছে এস অর্জ্জুন !…

অর্জ্জুন কাছে এসে বসল।…

ঃ আরো কাছে এস !…ওরে আজ যে আমি অন্ধ।…নেপালের মহারাজার গাড়ী-টানা স্যার ব্রজেন্দ্র আর আমি নই !…বলতে বলতে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেললেন !

ঃ রেণু ?···কাছে আয় মা !···

এক হাতে রেণুর একটি হাত ধরে অন্য হাতে অর্জ্জুনের একখানি হাত চেপে ধরলেন,—অর্জ্জুন ! আমার রেণুকে তুমি দেখো ! আমি জানি এর চাইতে বড় সহায় বা সম্বল এই পৃথিবীতে এখন আর কেউই ওর রইল না !···

ঃ বাবা গো !···রেণু ব্রজেন্দ্রনাথের বুকের 'পর লুটিয়ে পড়ল !

. গভীর স্নেহে কন্যার মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন ঃ ওরে কাঁদিস না !···চুপ কর ! ··তারপর টেনে টেনে বললেন ঃ আমার মৃত্যুর পর আমার এই দেহ আমার জন্মভূমি ইত্‌নার শ্মশানে নিয়ে গিয়ে যেন দাহ করা হয়। সেই মধুমতীর কোলে আমার শেষ শয়ন বিছিয়ে দিও।···জন্মভূমির ঠাণ্ডা মাটির তলে ঘুমিয়ে থাকব।

শেষ রাত্রের দিকে ব্রজেন্দ্রনাথের শেষ নিঃশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে গেল।

---

# চব্বিশ

আর ত কিছু নেই ! সব শেষ !...

এই সেই স্যার ব্রজেন্দ্রের জন্মভূমি ইত্‌না গ্রাম ! ঐ মধুমতী নদী তার ঘোলাটে জলে ঢেউয়ের নাচন তুলে বয়ে চলেছে কল্‌কল্‌, ছল্‌ছল্‌ !...

দাউ দাউ ক'রে চিতা জ্বলছে !...রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে আসছে। শ্মশানের বড় তেতুল গাছটার গোড়ায় চুপটি ক'রে বসে কাকামণি ও অমিতা !...

এমনি ক'রে সবারই ত' একদিন না একদিন শেষের ক্ষণ এগিয়ে আসবে ! মাটির পৃথিবীর বাঁধন কেটে যাত্রা হবে তার শুরু !...

রেণু ও অর্জ্জুনলাল প্রজ্জ্বলিত চিতার অদূরেই বসেছিল ; মৌন বেদনায় সবাই যেন আচ্ছন্ন !

: কাকামণি কেন চলে যাবেন, অর্জ্জুনদা ?

: তা ত' জানি না রেণু ; তবে এইটুকুই জানি তাকে যেতে হবে ! মানুষ আসে অনেক, চলেও যায় ত' কত ! কে তাদের খবর রাখে বল ? তা'রা অপর মানুষের প্রতিধ্বনি মাত্র বইত নয় ? মাঝে মাঝে সহসা এদের মধ্যে অগ্নিবরণ কেতন উড়িয়ে এক একজন অতি-মানুষ আসেন ; তা'রা পুরাতন জীর্ণতাকে উন্মূলিত ক'রে নবযুগের সাড়া আনেন ; তাদের প্রাণ অগ্নিশিখার মতই জ্যোতির্ম্ময়, দুরন্ত স্বাধীন তা'রা। চিরদিন অশান্ত বিদ্রোহী। চলার মন্ত্র বিলাবার

জন্যই তাঁরা পথিক। তাইতে বারবার তাদের ঘরের বাঁধন ছিঁড়তে হয়; এবং নিরন্তর নদীর ভাঙ্গা গড়ার মতই তাঁরা কখনও ভেঙ্গে কখনও গড়ে চলেন। কাকামণিরও তাই হয়ত যাবার সময় এল।

আবেগে শ্রদ্ধায় অর্জ্জুনের কণ্ঠস্বর কেঁপে কেপে থেমে গেল। নদীর কোল ঘেঁষে জলশয্যা ছেড়ে রাঙা উষ্ণীষ মাথায় সূর্য্যদেব সবে মাত্র উঁকি দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে কখন একসময় কাকামণি তাদের ঠিক পিছনটিতে এসে দাঁড়িয়েছেন কেউই তা টের পায়নি।

কাকামণি দু'জনের কাঁধের উপর দু'খানা হাত রেখে গভীর স্নেহে দু'জনকে আপন বিশাল বুকের উপর টেনে নিলেন; চোখের কোণে দু' ফোঁটা অশ্রু তখনও টলমল করছে।...